সুনীতি

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ

(ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিভাগ)

মাঘ—১৩২৫

মূল্য দেড়টাকা

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

উৎসর্গ

আমার
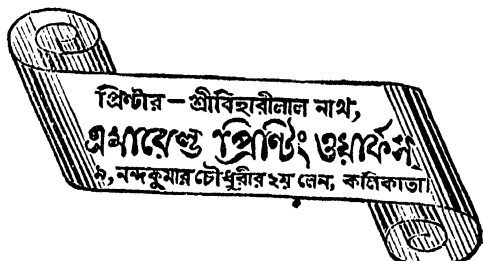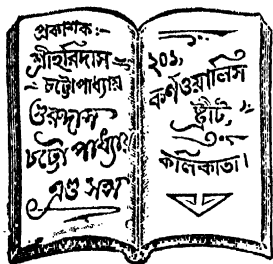
পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত রায় রামসদন চট্টোপাধ্যায়

বাহাদুরের

শ্রীচরণে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থ

সমর্পিত হইল।

কলিকাতা
পৌষ, ১৩২৫

গ্রন্থকার

সুনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

খুড়ীমা
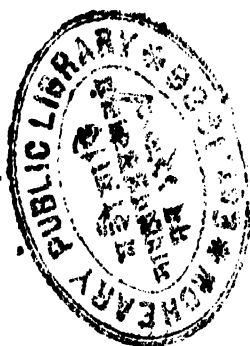
কাটোয়াতে সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে একটী ভদ্রলোক বাস করিতেন। সুরেশচন্দ্র বড়লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। সংসারে তাঁহার পত্নী বিনোদিনী, পুত্র অনুকূল এবং কন্যা মতিমালা ব্যতীত একটী পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, তাহার নাম সুনীতিকুমার। শৈশবেই সুনীতি মাতৃহীন হইয়াছিল। পিতা তাহাকে জনক ও জননী উভয়ের স্নেহ দিয়া পালন করিতেছিলেন। কিন্তু অল্প-কালমধ্যে তিনিও মানবলীলা সংবরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মৃত্যু-শয্যায় সুনীতির পিতা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়া গেলেন,—সে শোকপূর্ণ দৃশ্য এখনও সুরেশচন্দ্রের মনে মাঝে মাঝে উদিত হয়। সুরেশচন্দ্র সংকল্প করিয়াছিলেন তাঁহার অগ্র-জের অবর্ত্তমানে সুনীতি কোনও কষ্ট পাইবে না, তাঁহার নিজের পুত্রের ন্যায় সেও প্রতিপালিত হইবে। কেমন করিয়া তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল না, কেমন করিয়া তাঁহার পত্নী বিনোদিনী তাঁহাকে প্রতি

পদে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন,—সে দীর্ঘ অপ্রীতিকর কাহিনী বলিবার প্রয়োজন নাই। সুরেশ প্রথমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার স্ত্রীর প্রতিকূল আচরণ করিতেন,—তাঁহার গৃহের শান্তি সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের জন্য বহুবার বিনষ্ট হইয়াছিল,—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি পারিলেন না। তাঁহার পত্নীর রুক্ষ স্বভাব ও প্রবল রসনার নিকট তিনি পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত চেষ্টার ফল এই হইল যে সুনীতির উপর বিনোদিনীর আক্রোশ বাধা পাইয়া আরও বাড়িয়া উঠিল। সুরেশ অধিকাংশ সময়ে কর্ম্ম উপলক্ষে গৃহে অনুপস্থিত থাকিতেন। সুরেশের সম্মুখে বিনোদিনী তাঁহার ইচ্ছামত দুর্ব্যবহার করিতে পারিতেন না; কিন্তু সুরেশের অসাক্ষাতে তিনি সুনীতির প্রতি যথেষ্ট কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন এবং তাঁহার প্রবল ও নির্ম্মম হৃদয়ের সাধ্যানুসারে সেই ক্ষুদ্র অনাথ বালকের উপর অত্যাচার করিতেন।

সুনীতি এবং অনুকূল উভয়ে প্রায় সমবয়সী ছিল। তাহাদের বয়স এগার কিম্বা বার হইবে। মতিমালার বয়স সাত বৎসরের বেশী হইবে না। বৈকালবেলা স্কুল হইতে ফিরিয়া মতিমালাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া সুনীতির একটী দৈনিক কার্য্য ছিল। মতিকে বেড়াইতে লইয়া গেলে, অনুকূলের বৈকালের ফুটবল খেলা হয় না, তাই সে কখনও মতিকে বেড়াইতে লইয়া যায় না। সে দিন বৈকালবেলা মতিকে কাপড় পরাইয়া বিনোদিনী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। অনুকূল কতক্ষণ হইল স্কুল হইতে ফিরিয়া খাবার খাইয়া খেলিতে চলিয়া গিয়াছে। তথাপি সুনীতির দেখা নাই। সুনীতির যত দেরী হইতেছিল, তাহার খুড়ীমার মনে ততই ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল। অবশেষে মতি বেড়ান হইল না বলিয়া কান্না আরম্ভ করিল। প্রায় সন্ধ্যার সময় বই হাতে সুনীতি বাটী ফিরিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বিনোদিনী বলিলেন, "কি হে বাবু, এতক্ষণ কোথায় আড্ডা দিতে গিয়াছিলে? বেড়াতে যাবে বলে মেয়েটা কতক্ষণ থেকে বসে আছে, "এই সুনীতি দাদা আস্‌চে" "এই সুনীতি দাদা আস্‌চে" বলে পথ চেয়ে রয়েছে, তা' বয়ে গেছে সুনীতি দাদার, তিনি ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গেলেন, বাড়ীতে ফিরবার তাঁর নামও নাই। ইস্কুল ত অনুকূলও গিয়েছিল। সে কোন কাল বাড়ী ফিরে খাবার খেয়ে খেল্‌তে গেল, তোমার ফিরতে এত দেরী হয় কেন? ফির্‌লে যে মেয়েটাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে; তা ফির্‌বে কেন বল।"

সুনীতি চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া এই সকল বাক্যবাণ সহ্য করিতেছিল। কটুবাক্য তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাই বালক হইলেও নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আজ মাষ্টার মহাশয় ছুটির পর ক্লাসের সব ছেলেকে থাকিতে বলিয়াছিলেন। আমি অনুকূল দাদাকে ত বলিয়া দিয়াছিলাম যে ছুটির পর আমাদের পড়া হইবে, আমার বাড়ী ফিরিতে দেরী হইবে, সে যেন মতিকে বেড়াইতে লইয়া যায়।"

খুড়ীমা বলিলেন, "আচ্ছা ফিরে আসুক অনুকূল, তুমি কেমন বলেছিলে জিজ্ঞাসা কর্‌ব। তুমি ওইখানে বই রেখে খুকীকে বেড়াতে নিয়ে যাও।"

সেদিন বৈকালে সুনীতির আর খাবার খাওয়া হইল না। সে গৃহ-পার্শ্বে পুস্তকগুলি রাখিয়া খুকীর কাছে আসিয়া বলিল, "চল খুকী বেড়াতে যাই।" খুকী চোখের জল মুছিতে মুছিতে সুনীতির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

যথাসময়ে সুনীতি খুকীকে লইয়া বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল। তখনও

খুড়ীমার মুখ অপ্রসন্ন দেখিয়া সুনীতি নীরবে পুস্তকগুলি লইয়া পাঠগৃহে উপস্থিত হইল এবং আলো জ্বালিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে অনুকূল ফিরিয়া আসিল। ছুটাছুটি করিয়া অধিক পিপাসা হয় বলিয়া সে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এক গ্লাস মিশ্রির সরবৎ পান করিত। আজ তাহা প্রস্তুত হয় নাই, সে চাহিবামাত্র পাইল না। বলিয়া সে রাগিয়া, চেঁচাইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার ক্রোধ কিছু শীতল হইলে তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে অনুকূল, সুনীতিদের মাষ্টার কি আজ ছুটির পরেও পড়াচ্ছিল? সুনীতি যে বল্লে তা'র বাড়ী ফির্ত্তে দেরী হবে তাই তোকে নাকি ব'লেছিল যেন তুই খুকীকে বেড়াতে নিয়ে যাস্।" অনুকূল অম্লানবদনে বলিল, "আমি কিছু জানি না, আমাকে কেউ কিছু বলে নি।"

বিনোদিনী বলিলেন, "উঃ কি মিথ্যাবাদী ছেলে ঘরে পোষা হচ্চে! অনায়াসে নিজের দোষ তোর ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে গেল। ডাক্‌ত একবার সুনীতিকে। সুনীতি, এদিকে আয় ত।"

সুনীতি পাশের ঘর হইতে সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল। অনুকূলের মিথ্যা কথায় সে আশ্চর্য্য হয় নাই, অনুকূলের স্বভাব তাহার জানা ছিল। পড়া হইতে উঠিয়া যাইতে যাইতে সে মনে মনে ভাবিল, অনুকূলকে বলিবার কথা তাহার খুড়ীমাকে না বলিলেই ভাল হইত। বৈকালবেলার কটূক্তি হইতে আপনাকে বাঁচাইতে গিয়া এখন তাহাকে প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

সুনীতি ধীরে ধীরে বিনোদিনীর নিকটে উপস্থিত হইল। বিনোদিনী বলিলেন, "তোমার বেশ বিদ্যে হয়েচে। নিজে দোষ করে পরের ঘাড়ে খুব দোষ চাপাতে শিখেছ। এই ত অনুকূল রয়েছে। কি রে অনুকূল, তোকে সুনীতি ইস্কুলে বলেছিল যে তার বাড়ী ফির্ত্তে দেরী হবে?"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুকূল বলিল সকালে ইস্কুলে যাবার পর থেকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে সুনীতিকে দেখেই নাই।

সুনীতি অনুকূলের দিকে চাহিল। দেখিল অনুকূল তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া মুখভঙ্গি করিতেছে। সুনীতি তাহার দৃষ্টি সরাইয়া লইল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিনোদিনী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "কি, চুপ করে রৈলে যে? কি ব'লবার আছে বল। ভিজা বেরাঁলটির মত চুপ ক'রে থাকেন,—লোকে ভাবে আহা ছেলেটি কি শান্ত,—কিন্তু তাঁর পেটে যে কত বুদ্ধি তার কেউ খোঁজ রাখে না। আমি আগেই জানতাম সব মিথ্যে—উনি ইয়ারদের সঙ্গে মিলে চুরুট খেতে গিয়েছিলেন, তাই দেরী হয়েচে। দোষ আর কার ঘাড়ে চাপান যায়? আছেন অনুকূল দাদা, তাঁর ঘাড়েই চড়িয়ে দাও। পাজি, মিথ্যাবাদী ছোটলোক—না হবেই বা কেন? মা বাপ যেমন ছেলেও ত তেমনি হবে। মা ছিল ছোটলোকের বাড়ীর মেয়ে, মিথ্যা লাগিয়ে ঘর ভাঙ্গাই তাঁর কাজ ছিল। বাপ যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন জ্বালিয়ে গেছে, মরে যাবার সময় এক বজ্জাত অবাধ্য ছেলে ঘাড়ে ফেলে দিয়ে হাড় মাস পোড়াচ্চে।"

সুনীতি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী আরও কিছুক্ষণ পরলোকগত ভাশুর ও বড় জা'র উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করিয়া শুদ্ধ শ্রান্তিবশতঃ চুপ করিলেন।

সুনীতি আর পড়িবার ঘরে গেল না। বহির্ব্বাটীতে সে যেখানে শয়ন করিত তথায় উপস্থিত হইল। কটূক্তি সে প্রায় শুনিয়া থাকে কিন্তু আজ খুড়ীমা তাহার পুণ্যস্মৃতিময় পিতামাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে অসংযত ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। মলিন শয্যায় তাহার ক্লান্ত দেহ রক্ষা করিয়া

সে ভাবিতে লাগিল। অবিরলধারায় অশ্রুজল তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। মায়ের কথা তাহার কিছুই মনে ছিল না। পিতার নিকট সে শুনিয়াছিল মূর্ত্তিমতী স্নেহস্বরূপিণী তাহার মাতা তাহার অতি শিশুবয়সে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যহ শুইবার সময় সে তাহার মাতার কল্পিত মূর্ত্তির নিকট প্রণাম করিতে শিখিয়াছিল। সেই অজ্ঞাত দেবীর পবিত্র স্মৃতি এবং স্নেহময় পিতৃদেবের বিয়োগব্যথা তাহার হৃদয় অধীর করিয়া তুলিল।

গৃহকর্ত্তা অধিক রাত্রে বাটী ফিরিলেন। তখন অনুকুল খাইতে বসিয়াছে। সুনীতিকে না দেখিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায় বিনোদিনী স্বকপোলকল্পিত বহু অলঙ্কার সন্নিবিষ্ট করিয়া সুনীতির স্কুল হইতে পলাইয়া চুরুট খাওয়া ও অনুকূলের প্রতি মিথ্যা দোষারোপের বর্ণনা করিলেন। সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন সুনীতি তাহার খুড়ীমার গালি খাইয়া অভিমান বা মনঃকষ্ট হেতু খাইতে আসে নাই। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সুনীতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুক্ষণ রোদন করিবার পর সুনীতি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্রের আহ্বানে তাহার তন্দ্রা দূর হইল। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। সুরেশ চন্দ্র স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সুনীতি, চল বাবা খাইবে চল। খুড়ীমার কথায় কি রাগ করিতে আছে? গুরুজন যাহা বলেন তার ভাল মন্দ ধরিতে নাই।"

সুনীতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার খুড়ীমার বিরুদ্ধে সে কখনও খুড়ামহাশয়ের নিকট অভিযোগ করে নাই। সে জানিত খুড়ামহাশয় তাহাকে স্নেহ করেন। খুড়ীমা তাহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেন তাহা তিনি জানিতে পারিলে হয় তাঁহার নিষ্ফল মনস্তাপ হইবে নয় বাড়ীর

শান্তিভঙ্গ হইবে, কোনও সুফল হইবে না। কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। সে বলিল, "আমি রাগ করি নাই। খুড়ীমা আমাকে যত ইচ্ছা গালি দেন, আমি তাহাতে কখনও রাগ করিব না। কিন্তু আমার বাবা ও মাকে ছোটলোক এবং আরও কত কি বলিয়া গালি দিলেন, তাই বড় কষ্ট হইয়াছিল।"

ঝড়ের ন্যায় ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, "হারামজাদা ছেলে, আমার নামে লাগান হচ্চে। বেরো আমার ঘর থেকে।" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্রের বাধা দিবার পূর্ব্বেই তিনি সজোরে বালকের পৃষ্ঠদেশে তিন চারি চড় বসাইয়া দিলেন। "কর কি" "কর কি" বলিয়া সুরেশ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। বিনোদিনী কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সুরেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া বালককে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু সে রাত্রে তাহাকে কিছুই খাওয়াইতে পারিলেন না। বহুরাত্রে সুরেশচন্দ্র ভরাক্রান্ত হৃদয়ে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সে রাত্রে তাঁহারও আহার হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়।

বৈশাখ মাস। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। নক্ষত্রমণ্ডিত নৈশাকাশ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। কাটোয়া নগরের রাজপথ, বৃক্ষ, বাটী চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হইয়া হাসিতেছে। মনুষ্য এবং পশুপক্ষী সকলেই নিদ্রিত—যেন এই সৌন্দর্য্যের সমাহার তাহাদের জন্য রচিত হয় নাই। সকলেই নিস্তব্ধ—কেবল মধ্যে মধ্যে নৈশপবন সঞ্চালিত বৃক্ষপত্রা-বলির মর্ম্মরধ্বনি, এবং কদাচিৎ বিনিদ্র কুক্কুরের রব সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

রাজমার্গস্থ একটী গৃহের দরজা খুলিয়া একটী বালক রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। একবার চারিদিকে চাহিয়া রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চলিয়া ক্রমে নগরের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন লোকালয় বিরল হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ধান্য-ক্ষেত্র কখনও বা বৃক্ষবেষ্টিত পুষ্করিণী পথপার্শ্বে দেখা যাইতেছিল। বালক দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

পিতৃব্য চলিয়া যাইবার পর সুনীতি আর ঘুমায় নাই। সে স্থির করিয়াছিল যে এ বাটীতে আর থাকা হইবে না। তাহার মনে হইতেছিল যে যখন তাহার পিতামাতার নাম অপমানিত হইয়াছিল, তখনই তাহার সংকল্প করা উচিত ছিল, যে এ গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে; বোধ হয়

এই সংকল্প তখনও স্থির করিতে পারে নাই বলিয়াই বিধাতা নির্ম্মম কশাঘাত দ্বারা তাহার চৈতন্য করাইয়া দিয়াছিলেন। আহারের চিন্তা? লক্ষকোটি মূক প্রাণী এই পৃথিবীতে প্রত্যহ আহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, আর সে পারিবে না? তাহার বাহুতে শক্তি আছে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে এবং হৃদয়ে বল আছে,—সে নিজের চেষ্টায় তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিবে না? আর যদি নাও পারে,—তথাপি অবজ্ঞার সহিত প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করা অপেক্ষা, পথে অনশনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া একান্তভাবে তাহার স্বর্গস্থ পিতৃদেবকে ডাকিতে লাগিল। পরে গৃহের সকলে নিদ্রিত হইলে, বিপদবারিণী দুর্গার নাম গ্রহণ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

নগরের বাহিরে কিছুদূরে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী ছিল। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা সে পুষ্করিণী সমাবৃত। বালকদের মধ্যে প্রবাদ ছিল ঐ স্থান প্রেতিনীর আবাসভূমি কারণ রাত্রিকালে দূর হইতে অনেক বালক ঐ স্থানে বিচরণশীল আলোক দেখিতে পাইত। তথায় উপস্থিত হইয়া সুনীতির গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বৃহৎ শাখাপ্রশাখা লইয়া দুই তিনটা বড় বড় অশ্বত্থ গাছ সেই স্থানের চন্দ্রালোক অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বালক তথায় আসিয়া ক্ষণকালের জন্য অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইল। একবার ভাবিল ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহার খুড়ীমার রুক্ষস্বভাব ও কটূক্তি এবং সেই নির্দ্দয় প্রহার—হায়, এখনও বালকের পৃষ্ঠে সুবর্ণ বলয়াঘাতের ব্যথা শীতল হয় নাই। অতীত কয় বৎসর ধরিয়া বালক যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছে তাহার স্মৃতি বালককে অধীর করিয়া তুলিল। সে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া

দৌড়িতে দৌড়িতে সেই ভীতিকর স্থান অতিক্রম করিল। মাঠের পর মাঠ পার হইয়া সুপ্তিমগ্ন দুই চারিটী ছোট গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে কিছুক্ষণ ছুটিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া বালক চলিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রায় অবসান হইল। বালক দেখিল চন্দ্র পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতেছে, পূর্ব্বগগনে উষার অরুণ আলোক ফুটিয়া উঠিতেছে এবং আকাশে নক্ষত্র-মালা মলিন হইয়া যাইতেছে। অত্যধিক পরিশ্রমহেতু তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রাতে স্কুল যাইবার পূর্ব্বে যে আহার করিয়াছিল, তাহার পর আর কিছু উদরস্থ হয় নাই। চারি পাঁচ ঘণ্টায় সে দশ বার ক্রোশ অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত, দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। সম্মুখে দুইটি পথের সঙ্গমস্থল। তাহার পার্শ্বে একটি তৃণাচ্ছাদিত পরিষ্কার ভূখণ্ড। সে তথায় বসিয়া পড়িল। তখন পূর্ব্বাকাশের আলোক প্রবাহে পৃথিবীর দৃশ্যাবলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও নিদ্রোত্থিত পক্ষিকুলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠধ্বনিতে আকাশ প্লাবিত হইতেছে। সন্নিহিত উদ্যানের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্প সৌরভ আহরণ করিয়া উষার সমীরণ ধীরে ধীরে বালকের ক্লান্ত শরীর শীতল করিতে লাগিল।

একটি গরুর গাড়ী দূর হইতে মন্থরগতিতে আসিতেছিল। গাড়োয়ান আপন মনে সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল। গাড়ী যখন বালককে প্রায় অতিক্রম করিয়াছে তখন গাড়োয়ান হঠাৎ বালককে দেখিতে পাইল।

গাড়ী থামাইয়া সে বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?" বালক নিরুত্তর রহিল। গাড়োয়ান পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ গাঁয়ের ছেলে? এত ভোরে এখানে একা বসে কেন? কোথায় যাবে?"

ধীরে ধীরে বালক উত্তর করিল—কথা কহিবারও যেন তাহার সামর্থ্য ছিল না—"আমি কলিকাতা যাইব।" বালকের করুণ দৃষ্টি, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর এবং ক্লেশব্যঞ্জক অবস্থা দেখিয়া গাড়োয়ানের করুণার উদ্রেক হইল। সে বলিল, "কলিকাতা ত বহুদূরের পথ। তুমি আমার গাড়ীতে উঠ। আমি কিছুদূর আগাইয়া দিতে পারিব।" গাড়োয়ান বুঝিয়াছিল বালককে তাহার প্রকৃত অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালক মনঃকষ্ট পাইবে। সুনীতি খালি গাড়ীর উপর উঠিয়া শুইয়া পড়িল এবং অচিরাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও গুরুশ্রমে অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সূর্য্যালোক-প্রবোধিত গ্রাম এবং অনাবৃত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গোকণ্ঠ-বিলম্বিত ক্ষুদ্র ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে শকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। বালক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিল।

ঘুম ভাঙ্গিলে সুনীতি দেখিল মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। একখণ্ড তৃণ-হীন পরিষ্কার ভূমির মধ্যে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় গাড়ীটি রহিয়াছে। সেই স্থলে আরও কয়েকটি অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল; এবং তাহাদের ছায়ায় অন্যান্য গাড়ীর পার্শ্বে বসিয়া কয়েকটি গরু চক্ষু মুদিয়া নিশ্চিন্তভাবে জাবর কাটিতেছিল। অপরিচিত স্থানে ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমে সকলই অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। সুনীতিরও সেইরূপ বোধ হইল। তাহার মনে হইল সে কি করিয়া এ স্থানে আসিল। তখন অল্প অল্প করিয়া গত রাত্রের ঘটনা—খুড়ীমার ভর্ৎসনা, পিতৃব্যের নিকট অভিযোগ, প্রহার, গভীর রাত্রে পলায়ন এবং গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের সদয় ব্যবহার—সকল কথা মনের মধ্যে উদিত হইল। দীর্ঘনিদ্রায় তাহার ক্লান্তির উপশম হইলেও, বালক ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইল তাহার পরিচিত গাড়োয়ান বৃক্ষতলে আগুন জ্বালিয়া রন্ধন

করিতেছে। বালককে উঠিতে দেখিয়া সে বলিল, "ঐ পুকুরে হাত মুখ ধুইয়া এস। তার পর কিছু খাও।" নির্দ্দিষ্ট দিকে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া বালক সোপানশ্রেণীযুক্ত একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা দেখিতে পাইল। সেই দীর্ঘিকার চারিধারে বৃক্ষশ্রেণী। তাহাদের কৃষ্ণ ছায়া সরোবরের নীল জলে পড়িয়াছে। মন্দ পবনে জলের উপর ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইয়া সোপানের গাত্রে মৃদু আঘাত করিতেছে। ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। সুনীতি হাত মুখ ধুইয়া সোপানোপরি উপবিষ্ট হইল। আপন নিঃস্ব অবস্থার কথা মনে করিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। আজ সে আশ্রয়হীন। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য গাড়োয়ানের করুণার উপর নির্ভর। আজ যদি তাহার পিতা বাঁচিয়া থাকিতেন! বাম হাতের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া বালক অবনত বদনে ভাবিতেছিল। দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার চক্ষু হইতে স্খলিত হইয়া সরোবরের জলের উপর পড়িল। এমন সময় তাহার পশ্চাৎ হইতে গাড়োয়ান ডাকিল, "এই লও খোকাবাবু, একটু কিছু দিয়া জল খাও।" ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষের জল মুছিয়া বালক পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল গাড়োয়ানের হস্তে এক ডালা মুড়ি ও মুড়কি, তাহার উপর কয়েকখণ্ড গুড়ের পাটালি। সেদিন ক্ষুধার সময় দরিদ্র গাড়োয়ানের শ্রদ্ধার দান মুড়ি ও মুড়কি খাইয়া বালক যে তৃপ্তি পাইল, তাহার মনে হইল সেরূপ তৃপ্তি পূর্ব্বে সে কখনও পায় নাই। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর বালক জল পান করিয়া শীতল হইল। এবং গাড়ীর নিকট ফিরিয়া আসিল।

তাহারা পাণ্ডুয়ার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের নিকট দিয়া রেল লাইন গিয়াছে। রেলযোগে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য এস্থলে আনীত হয়, তাহার পর ব্যবসাদারেরা সেই দ্রব্যগুলি চারিদিকের গ্রামগুলিতে লইয়া যায়। আমাদের পরিচিত গাড়োয়ান এখান হইতে মাল

বোঝাই করিয়া ফিরিয়া যাইবে। বালক এখানে গাড়োয়ানের নিকট বিদায় লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর রেল লাইন দেখিতে পাওয়া গেল। তখন একটী ট্রেণ আসিতেছিল। রেলের গেটম্যান শিকল দিয়া চলিবার পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হুস হুস করিয়া গাড়ীও আসিয়া পড়িল। যাত্রিগণ গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। মেয়েদের গাড়ীতে কয়েকটী রমণীও বালিকার হাস্যপ্রফুল্ল মুখ দেখা যাইতেছিল। গাড়ী চারিদিকের ভূখণ্ড কাঁপাইয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেল। সুনীতি ভাবিল এই গাড়ীর আরোহীরা কত বিচিত্র দেশ দেখিতে দেখিতে যাইতেছে—ইহারা কত সুখী! গেটম্যান শিকল খুলিয়া দিল, বালক রেল লাইন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল।

পথের দুই পাশে ক্ষেত। ক্ষেতগুলি এখন শূন্য পড়িয়া আছে। একটী ক্ষেতে দুইটী কৃষক লাঙ্গল দিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে লাঙ্গলের রেখা ধরিয়া দুইটি বালিকা ঝুড়ি হাতে করিয়া মাটির মধ্য হইতে কি কুড়াইতে কুড়াইতে যাইতেছিল। কৌতূহলবশতঃ বালক নিকটে গিয়া দেখিল ছোট ছোট আলুতে মেয়ে দুইটির ঝুড়িগুলি প্রায় পূর্ণ হইয়াছে। বালক নিকটে একটী গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একটী কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। বালকের গলায় উপবীত দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ী কোথায়? কোথায় যাইবেন?"

বালক বলিল, "আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি, কলিকাতা যেতে হবে।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় দুইটি রমণী তাহাদের দিকে আসিতেছে দেখা গেল। বড়টির মুখে কোনও অবগুণ্ঠন ছিল না,—তাহার হাতে একটি ধামা। ছোটটির মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত; তাহার কোমরে একটী পিতলের কলস। গাছের তলায় একটি পরিষ্কার জায়গা দেখিয়া ইহারা জিনিষগুলি নামাইল। ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দ্বিতীয় কৃষক এবং তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী বালিকাদ্বয়ও আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথম কৃষক সুনীতিকে বলিল, "আপনি একটু জল খাবার খান।"

সুনীতি বলিল, "আমি একটু আগেই খেয়ে বেরিয়েছি। এখনও ক্ষিদে হয় নাই।"

কলসে জল ছিল। তাহার উপর একটী ছোট কাঁসার ঘটি। ঘটিতে জল লইয়া কৃষক দুইটি হাত পা ধুইল। তখন বড় স্ত্রীলোকটি ধামা হইতে দুইখানি পাথর বাহির করিয়া তাহাতে মুড়ি ঢালিয়া দিল। তাহারা লঙ্কা জল ও কিছু গুড় দিয়া মুড়ি খাইতে লাগিল। কনিষ্ঠা যুবতী ততক্ষণ বালিকাদের আহৃত আলুগুলির মাটি ছাড়াইতেছিল।

সুনীতি বুঝিল এই কৃষক দুইটি দুই ভাই। বালিকা দুইটি দুই ভাইয়ের কন্যা। বালিকা দুইটির জননীরা গ্রাম হইতে খাবার লইয়া আসিয়াছে। ছোট মেয়ে দুইটিও মুড়ি খাইল। তখন কৃষক-বধূদ্বয় কলস ও পাত্রগুলি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। বালিকা দুইটি সঙ্গে চলিল।

বড় ভাই সুনীতিকে বলিল, "আজ আপনাকে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে হবে।"

সুনীতির ইচ্ছা ছিল আজ আরও কিছুদূর যায়। কিন্তু এ স্থান ছাড়িয়া গেলে, আশ্রয় পাওয়া কঠিন হইতে পারে এই ভাবিয়া এবং

এই সরল কৃষক পরিবারটির গৃহস্থালি দেখিতে তাহার কৌতূহল হইয়াছিল বলিয়া সে স্বীকৃত হইল।

দুই ভাই ক্ষেতে আরও কিছুক্ষণ কাজ করিল। অতিথিকে বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে বলিয়া একটু শীঘ্রই কাজ সারিয়া ইহারা গ্রাম অভিমুখে চলিল। অদূরবর্ত্তী মনোহরপুর নামক গ্রামে ইহাদের বাস।

অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণমালা গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষের চূড়ায় পড়িয়া জ্বলিতেছিল। গরুর পাল গ্রামে ফিরিতেছিল, তাহাদের খুরোত্থিত ধূলায় আকাশ ধূসরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দীঘি পার হইয়া, জমীদারদের বৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাৎ দিয়া তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিল। যখন ঘরের নিকট আসিল, তখন আমাদের পূর্ব্বদৃষ্ট বালিকাদ্বয় এবং ছোট ছোট আরও দুই চারিটি শিশু কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া কৃষক দুইটির হাত ধরিল। সুনীতি বাহিরের ঘরে বসিল, অন্য সকলে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

বাহিরের ঘরের এক কোণে একটা উনান ছিল। কৃষক-রমণীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া গোময় লেপিয়া দিল। তাহার পর অতিথির আহারোপযোগী চাল ডাল প্রভৃতি এবং নূতন মৃৎপাত্র ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহারা উনান ধরাইয়া দিলে বালক রন্ধন করিতে বসিয়া গেল।

বালক যতক্ষণ রাঁধিতেছিল ততক্ষণ কৃষক দুইজন অদূরে বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বালকের পাক ও আহার শেষ হইয়া গেলে তাহারাও ভিতরে গিয়া খাওয়া দাওয়া করিল। অল্পক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বালক নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের সময় বালকের ঘুম ভাঙ্গিল। ঘোমটা মাথায় দিয়া

কৃষকবধূ উঠানে ঝাঁট দিতেছিল। ঝাঁট দিয়া গোয়াল পরিষ্কার করিয়া সে বাসন মাজিতে বসিল। ততক্ষণ বাড়ীর অন্য সকলে উঠিয়াছে। ছেলেমেয়েরা আঁচলে মুড়ি লইয়া খাইতে লাগিল। কৃষক দুইটির সহিত মাঠে গিয়া বালক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে ছোট বউয়ের বাপের বাড়ীর একজন মজুর বাহিরে বসিয়া রহিয়াছে।

ছোট বউয়ের ভাইয়ের সঙ্গে সে আসিয়াছে এবং দুইটি পাকা কাঁটাল কিছু আম ও তরকারি আনিয়াছে। তাহাদের বাড়ী নিকটবর্ত্তী গ্রামে। অল্প রাত্রি থাকিতে বাহির হইয়া ইহারা চলিয়া আসিয়াছে। ছোট বউয়ের ভাই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। সে নেহাৎ ছেলে মানুষ ও লাজুক। ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না। দুই ভাই তাহাকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিল। সুনীতি ও কুটুম্ব-বালক উভয়ে খাবার খাইল—মুড়ি, নারিকেলের লাড়ু, শশা, কাঁটাল প্রভৃতি। ছেলে-মেয়েরা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আম ও কাঁটাল খাইতে লাগিল।

একটু সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া সুনীতি এই শান্তিপূর্ণ কৃষক-পরিবারের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল। বালক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে চলিতেছিল। রাস্তার দুই ধারে গাছ। বালক গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলিতেছিল। মধ্যে মধ্যে বেশী শ্রান্ত হইলে ছায়ায় বসিতেছিল, বা পথের ধারে পুকুরে হাত মুখ ধুইতেছিল। বৈকালে সে হুগলি পৌছিল। সুনীতি একটী গঙ্গার ঘাটে কিছুক্ষণ বসিল। তখনও বেলা ছিল। সুনীতি হুগলি ও চুঁচুড়া পার হইয়া চলিল। হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল। নিকটে আশ্রয় নাই দেখিয়া বালক দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। পশ্চিম হইতে নিবিড় মেঘমালা অতি ধীরে এবং সুনিশ্চিত ভাবে আকাশে আরোহণ করিতেছে। তাহার নীচে

অস্পষ্ট ধূসরবর্ণে পৃথিবীর দৃশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কালো মেঘের গায়ে বিদ্যুতের দীপ্তি কখনও এক স্থানে কখনও আর এক স্থানে কখনও সমস্ত আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দানবের তরবারি সঞ্চালনের ন্যায় রুদ্রভাবে খেলা করিতে লাগিল। মেঘের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে সমস্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু বহিতেছে। ভাগীরথীর জল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষা-ফলকের ন্যায় সজোরে বালকের গাত্রে আঘাত করিতে লাগিল। চারিদিকে আর কিছুই দেখা যায় না। বালক ত্রস্তপদে চলিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা এরূপ চলিবার পর বিদ্যুতের আলোকে অদূরে গৃহের ন্যায় দেখা গেল। বালক পুনরায় বিদ্যুতের আলোকের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ হইলে দেখা গেল পথের ধারেই একটা ফটক। ভিতরে বাগান এবং তাহার মধ্যে একটী ছোট পাকা বাড়ী। বালক ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকের দরজা বন্ধ ছিল। বারাণ্ডার যেদিকে বৃষ্টির ঝাঁট কম বালক সেই দিকে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্য হইতে গীতধ্বনি শোনা যাইতেছিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বৃষ্টি থামিবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। বালক তখন সাহসে ভর করিয়া দরজায় ধাক্কা দিল। প্রথম কয়েকবার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। অবশেষে অনেকবার আঘাত করিবার পর দরজা খোলা হইল। বালক দেখিল ঘরটি আলোকে উদ্ভাসিত। মেজের উপর বহুমূল্য বিচিত্র গালিচা পাতা। চারিদিকে বড় বড় ছবি টাঙ্গান রহিয়াছে। উপর হইতে ঝাড় ঝুলিতেছে। যে বাবুটি দরজা খুলিয়া-

ছিলেন তিনি বালকের দিকে তীক্ষ্ণনয়নে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও ?"

বালক কহিল, "আমি বৃষ্টিতে ভিজিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাকে আশ্রয় দিন।"

বাবুটি বলিলেন, "এখানে সুবিধা হইবে না। অন্যত্র চেষ্টা দেখ।" এই বলিয়া দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "অচেনা লোককে থাকিতে দিয়া শেষে বিপদে পড়িব কি ?"

এই হৃদয়হীন কথায় বালকের চিত্ত ব্যথিত হইল। বৃষ্টির মধ্যেই সে বাহির হইয়া পড়িল। এমন সময় দেখিল বাগানের মধ্য দিয়া কে আলো লইয়া আসিতেছে। সে বাগানের মালী। বালকের কথা শুনিয়া সে বলিল, "এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাইবে। আজ রাত্রে আমার ঘরে থাকিবে চল।" বালক মালীর কুটিরে চলিল। বালকের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে দেখিয়া সে একটি মলিন শুষ্ক বস্ত্র দিল। বালক গা ও মাথা মুছিয়া কাপড় ছাড়িল। মালী পাথরের থালা করিয়া মুড়ি ও জিলেপী আনিয়া দিল। বালক তাহার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার পথে

প্রত্যূষে এই অনিচ্ছুক আশ্রয়দাতার আশ্রয় ছাড়িয়া বালক বাহির হইয়া পড়িল। সে চন্দননগরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে রাত্রি কাটাইয়াছিল সেটি নগরের উপকণ্ঠস্থ কোনও বড়লোকের বাগান-বাড়ী। যাইতে যাইতে আরও কয়েকটি বাগান-বাড়ী দেখিতে পাইল। কালিকার বর্ষণ-স্নিগ্ধ তরুলতার উপর প্রভাত-সূর্য্যের আলো পড়িয়া বড় মধুর দেখাইতেছে। বাগানে যূঁই, বেল, মল্লিকা, গোলাপ, চাঁপা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়াছে। দুই চারিটি বালিকা সাজি হাতে করিয়া পূজার ফুল সংগ্রহ করিতেছে। ক্রমে বালক নগরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। নগরের পাশেই ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ। ঘাটে দুই চারিটি লোক স্নান-আহ্নিক করিতেছে। স্থানে স্থানে ঘাটের ধারে নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। খেয়া করিয়া পরপার হইতে লোক আসিতেছে—কেহ দৈনিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে, কোনও স্ত্রীলোক মাথায় পসরা করিয়া তরকারি বিক্রয় করিতে আসিতেছে। গঙ্গাতীরে সুপ্রশস্ত রাজপথ, রাজপথের ধারে নবীন সূর্য্যালোকমণ্ডিত প্রাসাদগুলি শোভা পাইতেছে। নগরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সুনীতি একটী স্কুল দেখিতে পাইল। তখন সকালে স্কুল হইতেছে। স্কুলের বাহিরে মাঠের উপর ছেলেরা বেড়াইতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, খেলিতেছে। কেহ কেহ বটগাছের দীর্ঘশাখার প্রান্তে বসিয়া দোল খাইতেছে। এমন

সময় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। ছেলেরা স্কুল অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। সুনীতি ভাবিতে লাগিল কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে সে ইহাদেরই মত স্কুলে লেখাপড়া করিতেছিল। আজ সে বায়ুচালিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বালক অন্যমনস্কভাবে চলিতে লাগিল। নগর শেষ হইয়া গেল। ঘনতরু-বেষ্টিত কয়েকখানি গ্রামও পথের অনতিদূরে পড়িয়া রহিল। কালিকার বৃষ্টির জন্য বায়ু এখনও গরম হয় নাই। ক্রমে প্রায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। বালক ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর এবং আতপতাপে ক্লিষ্ট হইয়াছিল। দূরে বৃক্ষরাজির উপরে একটী মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছিল। বালক উহা লক্ষ্য করিয়া প্রায় আধঘণ্টা চলিবার পর একটা প্রাচীন দেবালয়ের নিকট উপস্থিত হইল। মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত। চারিদিকে পাথরের দেয়াল দিয়া ঘেরা। দেবালয়ের সম্মুখেই একটা বিস্তৃত নাটমন্দির। সেথানে কতকগুলি সাধু সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।

ছায়াতে অল্পক্ষণ বসিয়া আতপতাপ দূর করিবার পর বালক নিকটের সরোবরে স্নান করিতে গেল। মন্দিরের কাছে লোকালয় বড় একটা দেখা যায় না। পুকুরের চারিদিকের ব্যবচ্ছেদরহিত বৃক্ষশ্রেণী স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত। মনে হইতেছিল যেন জলের নীচেও বৃক্ষ ও আকাশ লইয়া আর এক দেশ বিরাজ করিতেছে। স্নান করিয়া সে বিগ্রহ দেখিতে গেল। সিঁড়ি দিয়া অনেকখানি নামিবার পর অন্ধকার ভূগর্ভে ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে একটী শিবলিঙ্গ দেখা গেল। বালক প্রণাম করিয়া মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল। মন্দিরগাত্রে দক্ষযজ্ঞ, কালিয়দমন, গোষ্ঠ-বিহার, রামের অভিষেক, গৌরাঙ্গের ষড়্ভুজ দর্শন প্রভৃতি নানা শৈব ও বৈষ্ণব ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে।

মন্দিরের পুরোহিত ও একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা পূজার ভোগ বহিয়া আনিলেন। পুরোহিত ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে অনেকক্ষণ পূজা করিলেন। ভোগ দেওয়া হইলে তিনি সন্ন্যাসীদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। তাহার পর বালকের পরিচয় লইয়া তাহাকে নিজ-ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি বালককে লইয়া খাইতে বসিলেন, তাঁহার কন্যা পরিবেশন করিতেছিল। খাইতে খাইতে তিনি নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। এই মন্দির কতদিনের প্রাচীন তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রবাদ আছে যে বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রির মধ্যে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুদিন সংস্কারাভাবে মন্দিরটি ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। বৈদ্যবাটির কয়েকটী ভদ্রলোকের উদ্যোগে সম্প্রতি তাহার পুনঃসংস্কার হইয়াছে। মন্দিরের কয়েক বিঘা দেবোত্তর জমি আছে। তাহা হইতে দেবসেবা ও অতিথিসৎকার একপ্রকার নিষ্পন্ন হয়।

তাহার পর ব্রাহ্মণের সংসারের কথা হইল। তাহার স্ত্রী বহুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। একটী পুত্র ছিল, বড় হইয়াছিল, আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেও পিতার বুকে নিদারুণ শেল আঘাত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। বাকী মাত্র এই কন্যা। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই মাসেই সে শ্বশুরালয়ে দ্বিরাগমন করিবে। কুটিরদ্বারে ঐ যে ফুলগাছগুলি রহিয়াছে, এগুলি তাহার কন্যাই রোপণ করিয়াছিল এবং দুই বেলা সে স্বহস্তে এই গাছগুলিতে জল-সিঞ্চন করে। পাশের গোয়ালে একটা গাই আছে, বালিকা প্রত্যহ তাহার সেবা করে, বালিকার কোনও দিন অসুখ করিলে গাইটিকে খাওয়ান কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। সম্প্রতি গাইটির একটী বাছুর হইয়াছে, বাছুরটি সারাদিন বালিকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়ায়। বালিকা চলিয়া

গেলে এই শূন্যপ্রায় কুটিরে কি করিয়া দিন কাটাইবে এই ভাবিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, এবং অশ্রুধারায় তাঁহার শীর্ণ বক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল।

সে রাত্রি বালক পুরোহিতের আলয়েই কাটাইল। পরদিন প্রাতে সে ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে কিছু খাবার দিলেন। আজ সারাদিন হাঁটিতে পারিলে সন্ধ্যার সময় কলিকাতা পৌঁছিতে পারিবে ইহা শুনিয়া বালক শীঘ্র শীঘ্র চলিতে লাগিল। বেলা আটটার সময় সে শ্রীরামপুরে পৌঁছিল। ভাগীরথীর অপর পারে ব্যারেকপুরের বাড়ীগুলি দেখা যাইতেছিল। বালক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিল। কোন্নগর পার হইয়া সে গঙ্গায় স্নান করিয়া গঙ্গাতীরে গাছের তলায় বসিয়া খাবার খাইল। এখান হইতে কিছুক্ষণ চলিয়া উত্তরপাড়া ও বালি ছাড়াইয়া আসিল। বেলা পড়িয়া গেল। সূর্য্যের তেজ কমিয়া আসিল। বৃক্ষচ্ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে লাগিল। এবং বৈকালের শীতলবায়ু জাগিয়া উঠিল।

পল্লীর দৃশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে প্রায় ব্যবচ্ছেদ-রহিত গৃহশ্রেণী। মধ্যে মধ্যে কারখানার দীর্ঘ চিমনি উর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া ধূম উদ্গার করিতেছে। পথে জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ গরুর গাড়ী, কদাচিৎ দুই একটা বিদ্যুৎ গতি মোটর গাড়ী। এই সব দেখিতে দেখিতে বালক সাবধানে অগ্রসর হইল।

সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই বালক একটী পুলের উপর আরোহণ করিল। তাহার নীচে অগণিত রেলওয়ে লাইন। স্থানে স্থানে অনেক-

গুলি লাল নীল আলো জ্বলিতেছে। কতকগুলি এঞ্জিন লাইনের উপর দিয়া চলা ফেরা করিতেছে। অদূরে তড়িদালোকে উদ্ভাসিত ষ্টেশনের জনাকীর্ণ প্ল্যাটফরম। এই পোল হইতে অবতরণ করিবার পরই বালক বিপুল হাওড়া পোলের নিকট আসিয়া পড়িল। বিদ্যুৎ আলোক পোল উদ্ভাসিত করিয়া নীচের তরঙ্গ-সমাকুল গঙ্গাজলে প্রতিফলিত হইয়াছে। তরতর করিয়া জোয়ায়ের জল উজান বহিয়া চলিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় অসংখ্য ষ্টীমার। মধ্যে মধ্যে ষ্টীমারগুলি বংশীধ্বনি করিতেছে। বালক ভক্তিভরে গঙ্গাকে প্রণাম করিল। সুন্দর হাওয়া দিতেছে। বালকের ইচ্ছা হইল এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। কিন্তু অবিরাম জনস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকায়, দাঁড়াইবার সুবিধা হইল না। পোল পার হইয়া বালক কলিকাতায় প্রবেশ করিল।

কলিকাতার জনসমুদ্রের মধ্যে বালক কিছুকাল আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম ছুটিতেছে। লোক ছুটাছুটি করিয়া ট্রামে উঠিতেছে। মোটরকারের পর মোটরকার দৌড়াইতেছে। অগণিত লোক হাঁটিয়া চলিয়াছে—সকলেই মহাব্যস্ত, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। বাল্যকালে—যখন তাহার পিতা বাঁচিয়াছিলেন—সেই সময় বিষ্ণুচরণ বাবু নামক তাহাদের একটী নিকট আত্মীয় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এই কথা সুনীতির বেশ মনে পড়ে। বিষ্ণুচরণ বাবু কলিকাতায় আহিরীটোলায় বাস করিতেন। সুনীতির বিশ্বাস ছিল, সে যদি বিষ্ণুচরণ বাবুর সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁহাকে তাহার অবস্থা নিবেদন করে তাহা হইলে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় পাইবে। কিন্তু তাঁহার বাসার ঠিকানা বালক জানিত না। জিজ্ঞাসা করিয়া সে আহিরীটোলায় পৌছিল। তথায় দুই চারিটি বাটীতে অনুসন্ধান করিল কিন্তু কেহ

বিষ্ণুচরণ বাবুর সংবাদ বলিতে পারিল না। তখন রাত্রি হইয়াছে। চানাচুর ও কুলপি বরফওয়ালারা ক্রেতার সন্ধানে গলিতে গলিতে চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে। প্রাসাদতুল্য একটী বাটীর পথিপার্শ্বস্থ সোপানের উপর বালক বসিয়া ভাবিতেছিল। রাত্রে আর ঘুরিয়া বেড়ান নিষ্ফল হইবে স্থির করিয়া বালক তথায় শুইয়া পড়িল। সেই দুঃখক্লিষ্ট ক্ষুদ্র বালকটিকে নিদ্রাদেবী পরম আদরে আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

ভোরের বেলা প্রস্তরাকীর্ণ রাজপথের উপর আবর্জ্জনাবাহী শকটের প্রবল কর্কশ শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিবসের কোলাহল এবং জনসমাগম তখনও আরম্ভ হয় নাই। রাস্তার উভয় পার্শ্বে স্ত্রীলোকেরা কেহ স্নান করিতে যাইতেছে, কেহবা স্নান করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের অনুসরণ করিয়া বালক অল্পকালমধ্যে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সেখানে বালক স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিল। পরিহিত বস্ত্রের আধখানা পরিয়া আধখানা করিয়া শুকাইয়া লইল। তাহার পর পুনরায় পুরাতন আত্মীয়ের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। কিন্তু গত রাত্রের ন্যায় তাহার চেষ্টা বিফল হইল। বেলা বাড়িয়া চলিল। সূর্য্যের তেজ ক্রমশঃ অধিক পীড়াদায়ক হইল। রাস্তার কল হইতে বালক কয়েকবার জলপান করিল। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইবার পর বালক পুনরায় গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। শ্রান্তিবশতঃ একটী ঘাটের নিকট উপবিষ্ট হইয়া দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোতগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বালক দেখিল যদি সে কোনও উপার্জ্জনের পথ অবলম্বন না করে তাহা হইলে তাহাকে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ঘাটের কাছে কয়েকটী নৌকা বাঁধা ছিল। বালক তাহাদের নিকটে গিয়া একজন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে সে কোনও কাজ পাইতে পারে কি না। মাঝি অপর নৌকার মাঝি-

দিগকে জিজ্ঞাসা করিল। বালকের নবীন বয়স দেখিয়া অনেকেই তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করিল। একজন বলিল সে বালককে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে কিন্তু কোনও বেতন দিবে না। খাইতে দিবে এই পর্য্যন্ত। অগত্যা বালক তাহাতেই স্বীকৃত হইল। চতুর মাঝি বালকের বলিষ্ঠ শরীর দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে তাহার নিকট অনেক কাজ আদায় করা যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিন্দুমাধব বাবু

বিন্দুমাধব বাবু নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। তাঁহার নিবাস রাঢ়দেশে কিন্তু বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে সপরিবারে কলিকাতায় থাকিতে হয়। ভাটার টানে নৌকা দ্রুত-গতিতে চলিতেছিল। শ্রাবণ মাস। বেলা পড়িয়া গিয়াছে। পশ্চিম গগনে অস্তোন্মুখ সূর্য্যকিরণে কয়েকখণ্ড মেঘ জ্বলিতেছে। নদীতীরের বৃক্ষাবলী এবং হর্ম্ম্যরাজির শীর্ষদেশ সৌর-রশ্মি বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বিন্দুমাধব বাবুর দৃষ্টি সেদিকে ছিল না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার করস্থিত পুস্তক-পাঠে মগ্ন। মধ্যে মধ্যে তিনি পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া দূরে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তাকীর্ণ ললাট এবং গম্ভীর মুখ দেখিলে বোধ হয় না যে, প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেকক্ষণ তিনি এই ভাবে

পুস্তক পাঠ করিবার পর যখন আলোক অস্পষ্ট হওয়াতে পুস্তকের অক্ষর দেখিতে কষ্টবোধ হইল, তখন তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা বড়বাজারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বিন্দুমাধব বাবু তাঁহার ব্যাগ ও ছাতা হাতে লইয়া মাঝিকে ভাড়া দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া গেলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিলেন যে পুস্তকখানি ব্যাগের ভিতর রাখা হইয়াছে, কিম্বা ব্যস্ততা-নিবন্ধন পুস্তকের কথা বিস্মৃত হইলেন,—পুস্তকখানি নৌকার মধ্যে অন্ধকারে পড়িয়া রহিল। নৌকাখানি ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিন্দুমাধববাবু ট্রামে করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। গলির মধ্যে তাঁহার বাসা। রাস্তা হইতে ঢুকিতেই বামপার্শ্বে বসিবার ঘর। মধ্যস্থলে ছোট টেবিলের উপর একটী আলো মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল। বিন্দুমাধব বাবু আলো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া খাটের উপর বসিলেন ও ব্যাগের মধ্যের জিনিষগুলি বাহির করিয়া রাখিলেন। তখন দেখিলেন পুস্তকটি ব্যাগের মধ্যে নাই। পুস্তকখানি না দেখিতে পাইয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকটিত হইল। হায় সেই পুস্তকের মধ্যে তিনি তাঁহার সদ্যোমৃতা কন্যার ফটোগ্রাফখানি রাখিয়াছিলেন। সে ফটোগ্রাফের দ্বিতীয় কাপি তাঁহার ছিল না।

বিন্দুমাধব বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পত্নী অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নৌকাতে আমি একখানি বই ফেলিয়া আসিয়াছি। তাহার মধ্যে কল্যাণীর ছবিখানি রাখিয়াছিলাম। আমি এখন ফিরিয়া গিয়া দেখি, নৌকাখানি খুঁজিয়া যদি বাহির করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা রান্নাঘরে গিয়া রান্না শেষ করিলেন। তাহার পর ছেলে ও মেয়েকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইলেন। তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে তিনি

স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। গৃহ-কোণস্থ প্রদীপের অস্থির আলোক সুপ্ত পুত্রকন্যার মুখের উপর পড়িয়াছিল। দ্বারপার্শ্বে দাসী বসিয়াছিল। বাহিরের ঘরের ঘড়িতে নয়টা, দশটা, এগারটা বাজিয়া গেল। তথাপি স্বামী ফিরিলেন না। তখন অন্নপূর্ণা ঝি এবং চাকরদিগকে ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাত্রি বারটার পর বিন্দুমাধব বাবু বাড়ীতে ফিরিলেন। তাঁহার মলিন ও বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া অন্নপূর্ণা বুঝিলেন পুস্তকখানি এবং ছবিটি পাওয়া যায় নাই। রাত্রে বিন্দুমাধব বাবু কিছু আহার করিলেন না। কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন আফিস যাইবার সময় বিন্দুমাধব বাবু সংবাদপত্রের জন্য একটী বিজ্ঞাপন লিখিয়া লইয়া গেলেন। কেহ তাঁহার হারান পুস্তকখানি এবং তাহার মধ্যের ছবিটি ফিরাইয়া দিলে তাহাকে তিনি ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। পাইবার আশা অতি অল্প ছিল। তথাপি শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

বেলা দুইটা হইয়া গিয়াছে। শ্রাবণের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই এক পশলা বৃষ্টি পড়িতেছে। ঝি এবং চাকর আহার সমাপন করিয়া নিদ্রামগ্ন ছিল। অন্নপূর্ণা পুত্রকন্যাদের লইয়া উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। খোকার বয়স পাঁচ বৎসর হইবে। কিছুদিন হইল সে প্রথম ভাগ আরম্ভ করিয়াছে। সে মহা উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে আট্‌কাইয়া গেলে মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করে। কন্যাটির নাম মৃন্ময়ী। তাহার বয়স নয় বৎসর হইবে। মায়ের নিকট সে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে একটী সেলাইয়ের কাজ শিখিতেছিল। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাবু বাড়ীতে আছেন?" মা ও মেয়ে উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

তাহাদেরই বাড়ীর সম্মুখে কে আবার ডাকিল, "বাবু বাড়ীতে আছেন?" মা বলিলেন, "মিনু, দেখে এস ত মা কে ডাকৃচে। লোকগুলো নীচে ঘুমুচ্চে—ওরা কিছুতেই উঠবে না।" মৃন্ময়ী সেলাইয়ের কাজ রাখিয়া দিয়া নীচে চলিয়া গেল।

যে নৌকা ভাড়া করিয়া বিন্দুমাধব বাবু দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন, সুনীতি সেই নৌকাতেই কাজ করিত। বিন্দুমাধব বাবু নামিয়া যাইবার পরদিন সে নৌকাতে বইখানি দেখিতে পাইল। পাতা উল্টাইয়া দেখিল তাহাতে বিন্দুমাধব বাবুর নাম এবং ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। আরও দেখিল পুস্তকের মধ্যে একটী বালিকার ফটোগ্রাফ রহিয়াছে। সুনীতি আহারাদি করিয়া পুস্তকখানি ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বহু অনুসন্ধানের পর সে বাড়ীখানি বাহির করিতে পারিয়াছে। তাহার পরিধানে একটী আধ-ময়লা কাপড়, গায়ে একটা মোটা চাদর, তাহা বৃষ্টিতে প্রায় ভিজিয়া গিয়াছে। পুস্তকে লিখিত নম্বরের সহিত বাটীর নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া সে দ্বারে করাঘাত করিয়া দুইবার ডাকিল, "বাবু বাড়ীতে আছেন?" তাহার পর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মৃন্ময়ী অর্গল মোচন করিয়া দ্বার খুলিতে সুনীতি বলিল, "বিন্দুমাধব বাবু এখানে থাকেন?"

মৃন্ময়ী বলিল, "হ্যাঁ। তিনি এখন আফিসে গিয়াছেন।"

সুনীতি বলিল, "কাল তিনি নৌকাতে এই বইখানি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তাই আমি ফেরৎ দিতে আসিয়াছি। বহির মধ্যে এই ছবিখানি ছিল।"

এই বলিয়া সুনীতি চাদরের মধ্য হইতে বই এবং ছবিখানি মৃন্ময়ীর হাতে দিল। মৃন্ময়ী বলিল, "আমি মাকে দিয়া আসি, তুমি একটু দাঁড়াও।"

এই বলিয়া বালিকা উপরে চলিয়া গেল। মৃন্ময়ীর মাতা বই এবং ছাবিখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং গলবস্ত্র হইয়া উদ্দেশ্যে মা কালীকে প্রণাম করিলেন। মৃন্ময়ী বলিল, "বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটী ছেলেমানুষ বইটি নিয়ে এসেচে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তাকে উপরে ডেকে নিয়ে এস।"

বালিকা সুনীতির নিকটে গিয়া বলিল, "মা তোমাকে ডাক্‌ছে উপরে এস।" এই বলিয়া পথ দেখাইয়া সুনীতিকে উপরে লইয়া গেল।

অন্নপূর্ণার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুনীতি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তোমার নাম কি বাছা? তুমি এ বই কোথায় পেলে?"

বালক উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমার নাম শ্রীসুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়। আমি যে নৌকাতে কাজ করি সে নৌকাতে বইখানি পড়িয়াছিল। বইয়ের মধ্যে বাবুর নাম আর ঠিকানা দেখিতে পাইয়া আমি তাহা লইয়া আসিয়াছি।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তোমার চাদরটা ভিজে গেছে, ওখানা খুলে রেখে দাও। তুমি ত দেখচি বামুনের ছেলে, লেখাপড়াও জান। তুমি নৌকাতে কি কাজ কর? তোমার বাপ মা আছেন ত?"

অন্নপূর্ণার সস্নেহ ব্যবহার বালকের হৃদয় স্পর্শ করিল। ধীরে ধীরে গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া সে বলিতে লাগিল, "আজ্ঞা না, আমার মা বাপ বাঁচিয়া নাই। মা আমার অতি শিশুকালেই মারা গিয়াছেন। তাহার পর আমার নয় বছর বয়সে আমার বাবাকেও হারাই। সেই অবধি খুড়ামহাশয়ের বাটীতে আমি প্রতিপালিত হইতেছিলাম।" তাহার পর বালক তাহার ক্ষুদ্র জীবনের করুণকাহিনী বলিয়া গেল। তাহা শুনিতে শুনিতে অন্নপূর্ণার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল; বালকের

কথা সমাপ্ত হইলে তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আজ থেকে তুমি এইখানেই থাক বাবা, তোমাকে আর নৌকাতে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। আমার খোকাকে পড়াইবে আর তুমি নিজেও ইস্কুলে ভর্ত্তি হইবে। বাবু আফিস থেকে ফিরিলে সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আজ থেকে তুমি আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে।" এমন স্নেহকোমল কণ্ঠ বালক অনেকদিন শুনে নাই। সেই স্নেহস্পর্শে বালকের হৃদয় গলিয়া গেল, মনের মধ্যে তাহার পিতৃস্নেহের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে অবনত বদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা সুনীতিকে জলখাবার খাওয়াইলেন। বৈকালে সুনীতি খোকার সহিত অল্প অল্প ভাব করিয়া লইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিন্দুমাধব বাবু বাড়ী ফিরিলেন। তিনি আসিতেই অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ওগো তোমার বই আর ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়াছে। নৌকাতে পড়িয়াছিল এই ছেলেটি কুড়াইয়া আনিয়াছে। আহা ছেলেটির মা বাপ নাই, খুড়ীমার অত্যাচারে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে, শেষে নৌকাতে কাজ করছিল। আমি বলেছি সে এখানে থাক্‌বে। লেখাপড়া জানে। খোকাকে পড়াতে পারবে। আর নিজেও ইস্কুলে পড়বে।"

অন্নপূর্ণা ফটোখানি আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। বিন্দুমাধব বাবু আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ফটোখানি বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কই গো ছেলেটি কোথায়?"

সুনীতি কাছে আসিলে বলিলেন, "তুমি যে আজ আমাকে কত অমূল্য ধন দিয়াছ তাহা তুমি জান না। সারা জীবন খুঁজিলেও আমি আর ইহা পাইতাম না। তোমার কথা আমি সব শুনিয়াছি। আজ হইতে তুমি ঘরের ছেলের মত এখানে থাকিবে।"

পরদিন বিন্দুমাধব বাবু সুনীতির নামে একটি পাশ বই খুলিয়া ১০০৲ টাকা জমা দিলেন। সুনীতি ইস্কুলে ভর্ত্তি হইল। খোকা প্রত্যহ সকালে তাহার নিকট পড়িত। আর একজন তাহার নিকট পড়া বলিয়া লইত এবং পাঠ ব্যতীত নানা অপ্রাসঙ্গিক গল্প করিত এবং গল্প শুনিতে চাহিত,—তাহার নাম মৃন্ময়ী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু

কাশীতে একটী বৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতলস্থ কক্ষে একটী বালক রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। কক্ষের জানালাগুলি-বন্ধ, সুতরাং বাহিরে আলোক যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও কক্ষের মধ্যে এত অন্ধকার যে বাহির হইতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিলে, প্রথমে তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইলে পর গৃহাভ্যন্তরস্থ দ্রব্যসমূহ একে একে প্রকাশিত হইত—তখন দেখা যাইত যে কক্ষের মধ্যস্থলে শীর্ণকায় একটী বালক শুইয়া রহিয়াছে, এবং তাহার শিয়রে একটী প্রবীণবয়স্ক ব্যক্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে একটী গোলাকার ক্ষুদ্র টেবিল, তদুপরি একটী টাইমপিস্ ঘড়ি, থার্ম্মমিটার, দুই তিনটি ছোট বড় ঔষধের শিশি এবং দুই এক খণ্ড ভাঙ্গা বেদানার অংশ রহিয়াছে। বালকের চক্ষু মুদিত ছিল। ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত তাহার বক্ষ অতি ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছিল। ভদ্রলোকটী নির্নিমেষ নয়নে বালকের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি উদ্বিগ্ন এবং ললাটে

চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত। কিছুক্ষণ পরে বালক চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা"। তাড়াতাড়ি বালকের নিকট মুখ লইয়া গিয়া ভদ্রলোকটী স্নেহপূর্ণস্বরে আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা ?"

"বড় তৃষ্ণা।"

"একটু বেদানার রস দেব বাবা ?"

বালক বলিল, "দাও।"

কাঁচের বাটিতে বেদানার রস ঢাকা ছিল। চাম্‌চে করিয়া দুইবার মুখে দিলেন। বালক খাইয়া বলিল, "একটু জল।"

জল খাইয়া বালক বলিল, "বাবা বেলা কত হবে ?"

পিতা বলিলেন, "বৈকাল হইয়াছে। বেলা ৪টা ৪৷৷০টা হইবে।"

বালক বলিল, "বাবা একটা জানালা খুলিয়া দাও। একটু রোদ দেখ্‌ব।"

পিতা উঠিয়া গিয়া পশ্চিমের একটী জানালা খুলিয়া দিলেন, তাহার মধ্য দিয়া সৌর কিরণমালা স্বর্ণ ধারায় প্রবাহিত হইয়া শয্যাতলে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিফলিত আলোকে কক্ষস্থ যাবতীয় বস্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিতা ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপবেশন করিলেন।

সেই রৌদ্র ধারার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালক বলিল, "বাহিরে এমন সোনার আলো, ঐ নগরের মধুর কোলাহল, আমি কি আর এ সকল দেখিতে ও শুনিতে পাইব না ? হায় ভগবান্ !"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে পিতা বলিলেন, "কেন এরূপ বলিতেছ বাবা ? তুমি ভাল হইয়া উঠিবে। আবার হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে।" মুখে এইরূপ বলিলেন কিন্তু তিনি মনে মনে জানিতেন যে তাহার আশা অতি অল্প। চিকিৎসা যতদূর করাইবার তিনি করাইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার গিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই পীড়ার

উপশম হয় নাই। মধ্যে মধ্যে যখন দুই তিন দিন ধরিয়া বালক লুপ্তসংজ্ঞা হইয়া পড়িয়া থাকিত এবং ঔষধের প্রভাব ও ডাক্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হইত—তখন তিনি নিরুপায় হইয়া যুক্তকরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন; বাহিরে রাজপথের উপর অবিরাম গতিতে প্রবাহিত জনস্রোতের দিকে চাহিয়া ভাবিতেন, এত লোক সুস্থশরীরে মুক্তবাতাসে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর তাঁহার পুত্র—তাঁহার বিয়োগসন্তপ্ত জীবনের একমাত্র অবলম্বন,—সে ইহাদের মত, এত অসংখ্য লোকের মধ্যে একজনের মত, হইতে পারিবে না?

তিনি চেয়ারখানি শয্যার আরও নিকটে আনিলেন এবং বালকের শীর্ণ পাণ্ডুর কপালের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। দীর্ঘ অসংস্কৃত কেশ বালকের কপাল ছাপাইয়া প্রায় চোখের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল, তিনি সযত্নে চুলগুলি সরাইয়া দিতে লাগিলেন। বালকের বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি জলভরে ছল্‌ছল্‌ করিতে দেখিয়া তিনি ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কাঁদ্‌ছ বাবা? কি কষ্ট হচ্চে বল।"

অশ্রু সংবরণ করিয়া বালক বলিল, "আমি বুঝ্‌তে পার্চ্চি বাবা যে আমি যাচ্ছি। আমার আর বেশী সময় নাই। কিন্তু তার জন্য আমি কাঁদচি না। মর্‌তে একদিন ত হবেই। ভগবানের কাছ থেকে এসেছি তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্চি। তার জন্য কষ্ট হচ্চে না। আমার কষ্ট হচ্চে এই ভেবে যে তুমি মনে বড় আঘাত পাবে। আমার চোখে জল দেখিলে তুমি আহার নিদ্রা ভুলিয়া থাকিতে, কোথাও কোনও ভাল জিনিস দেখিলে তুমি তাহা আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে, এখন থেকে আজীবন আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে তোমার কি কষ্ট হবে তাই ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।"

তাহার পিতা কথা বলিতে দুই তিন বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার

বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দিবসের আলোক ধীরে ধীরে মলিন হইয়া গেল। পক্ষিকুল শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষশাখায় ফিরিতে লাগিল। এবং নগরের অসংখ্য দেবমন্দির হইতে আরতির ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। পিতা পুত্রে নীরব রহিলেন।

প্রায় বিশবৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বাবু অর্থোপার্জ্জন মানসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যবসাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার কপালে সুখ লেখেন নাই। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার পুত্রটিও মৃত্যুমুখে। তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য আজ ব্যর্থ বোধ হইতেছে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সুধীর নামে বালকের একটী সহপাঠী তাহার সংবাদ লইতে আসিল। তাহারা দুইজনে একসঙ্গে স্কুল যাইত এবং একসঙ্গে খেলা করিত। স্কুলের মাষ্টার এবং অন্য ছাত্রেরা তাহাদের উভয়কে অত্যন্ত ভালবাসিত। বালকের অসুখ যখন হইতে সাংঘাতিক ভাব ধারণ করে, সেদিন হইতে সুধীর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া থাকিত। বৈকালে সে আর খেলিতে যাইত না। বন্ধুর রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। কৃষ্ণমোহনবাবুর এবং বালকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সুধীর আজকাল বৈকালে একটু করিয়া বেড়াইয়া আসে কিন্তু খেলিতে যায় না। বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বালকের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহার পর বাড়ী ফেরে। সুধীর আসিয়া বলিল, "মাষ্টার মহাশয় রোজ যেমন জিজ্ঞাসা করেন আজও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের ক্লাসের অনেকেই জিজ্ঞাসা করিল এবং আমার নিকট সংবাদ শুনিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। ছেলেরা ক্লাসে আর পূর্ব্বের ন্যায় গোলমাল করে

না, দুই চারিজন অবাধ্য বালক কদাচিৎ অন্যায় আচরণ করিলেও মাষ্টার মহাশয় তাহাদের তেমন করিয়া শাসন করেন না। ছুটির ঘণ্টা শুনিলে বালকেরা পূর্ব্বের ন্যায় কোলাহল করিতে করিতে ক্লাস হইতে ছুটিয়া বাহির হয় না। ভাই তোমাকে ক্লাসের ছেলেরা কত ভালবাসে তাহা তুমি জান না। আবার কবে তুমি ভাল হইয়া স্কুলে গিয়া বসিবে, ছেলেরা তোমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইবে, মাষ্টার মহাশয় প্রফুল্ল হইবেন ?”

বালক কহিল, “ভাই সেদিন আর আসিবে না। মাষ্টার মহাশয় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন ; এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যান। ক্লাসের ছেলেরা আমাকে কতদূর ভালবাসে তাহা তোমার নিকট শুনিলাম। তাহাদের দয়ার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ আমার হইল না, তুমি তাহা-দিগকে বলিও। তুমি বলিও তাহারা যেন আমার জন্য বেশী দুঃখ না করে। তাহারা আমার পীড়ার সময় সহানুভূতি করিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া আমার কষ্টের লাঘব হইল। আমার এই অনুরোধ যেন তাহারা বৈকাল বেলা খেলা করিতে করিতে—যখন সূর্য্যের মৃদু আলো গাছের পাতার মধ্য দিয়া সবুজ মাঁঠের উপর আসিয়া পড়িবে,—তখন যেন তাহারা মধ্যে মধ্যে আমার কথা মনে করে, মনে করে যে আমি বৈকালে মাঠে গিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতে খুব ভাল বাসিতাম। আর তুমি ভাই সুধীর, তুমি এমন করিয়া থাকিও না। তুমি আমাকে কখনও ভুলিবে না তাহা জানি। কিন্তু তুমি যদি আমার জন্য এত কষ্ট পাইতে থাক তাহা হইলে আমার দুঃখের শেষ থাকিবে না।”

রাত্রি হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সুধীর বাড়ী চলিয়া গেল।

এই ভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। সুধীর প্রত্যহ আসিত। মাষ্টার মহাশয় দুই তিন দিন আসিয়াছিলেন। একদিন—সেদিন ছুটি

ছিল—মাষ্টার মহাশয় দু'পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বালকের নিকট বসিয়া রহিলেন। তিনি তাঁহার সহিত কয়েকটি বহি আনিয়াছিলেন। বালককে কতকগুলি গল্প বলিলেন,—অধিকাংশই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়,—ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, সরল বিশ্বাস, আত্মার অমরতা, এবং জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম,—এই সব সম্বন্ধে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার আনীত বহি হইতে তিনি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। তাহার পর যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল এবং সুধীর আসিয়া মাষ্টার মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বালকের পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন তিনি পুস্তক বন্ধ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বালকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন সমস্ত দিবস যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সন্ধ্যার দিকে বালক ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পিতা শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। চাকর গৃহে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া সংবাদ দিল ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। কৃষ্ণমোহনবাবুর অনুমতি পাইয়া চাকর ডাক্তারবাবুকে গৃহে লইয়া আসিল। ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে এবং সাবধানে বালককে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কৃষ্ণমোহনবাবু তাঁহার সহিত বাহিরে আসিলে, ডাক্তারবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "আপনাকে না বলিলেও নয়, অথচ আপনাকে বলিতে আমার বাক্য সরিতেছে না। আজ আপনার পুত্রের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দেখিলাম। আজ রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।" শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণমোহন বাবুর চক্ষে সকলই অন্ধকার হইয়া আসিল, ডাক্তার বাবুর কথা তাঁহার কর্ণে দূরাগত কণ্ঠ-ধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল। মস্তকে কঠিন আঘাত পাইলে মানুষ যেমন অবশ হইয়া বসিয়া পড়ে, তিনি সেইভাবে বসিয়া পড়িতেছিলেন, ডাক্তারবাবু তাঁহাকে ধরিয়া নিকটস্থ একটী চেয়ারে

বসাইলেন। ধীরে ধীরে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলে ডাক্তারবাবু বলিলেন "একটু সুস্থ বোধ করিতেছেন কি?" কৃষ্ণমোহনবাবু উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ সুস্থ হইয়াছি। ডাক্তার বাবু আজ রাত্রে তাহা হইলে আপনাকে এখানে থাকিতে হইবে।" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। ইহার মধ্যে কোনও ভয়ের কারণ নাই, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।"

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ডাক্তারবাবু আহারাদি শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কয়েকটি আবশ্যকীয় ঔষধ আনিয়াছিলেন সেগুলি টেবিলের উপর রাখিলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন কিন্তু বালকের নিদ্রা ভাঙ্গিল না। কৃষ্ণমোহনবাবু নিম্নস্বরে ডাক্তারবাবুকে বলিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে। পাশের ঘরে আপনার শয্যা প্রস্তুত আছে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। প্রয়োজন হইলে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।" ডাক্তারবাবু বলিলেন "প্রয়োজন বোধ হইলেই আমাকে ডাকিবেন, কোনও সঙ্কোচ করিবেন না।" ডাক্তারবাবুকে পাশের ঘরে শয্যা দেখাইয়া আসিয়া কৃষ্ণমোহনবাবু বসিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণমোহনবাবু আসন হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পদচারণ করিলেন, তাহার পর একটী ঈষন্মুক্ত জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সম্মুখে বিশাল নগরী। অসংখ্য সৌধমালার মধ্যে নগরের অধিবাসিগণ দিবসের পরিশ্রমের পর রাত্রে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। চন্দ্রের কিরণমালা সেই সকল গৃহশীর্ষ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে, এবং দূরে গঙ্গার প্রবাহের উপর নিপতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। কৃষ্ণমোহনবাবুর মনে হইতে লাগিল বহুদিন পূর্ব্বে এমনই একটী জ্যোৎস্নারাত্রে তাঁহার জীবনের প্রিয়তমা সহচরীকে তিনি ঐ গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত করিয়া আসিয়াছিলেন, তেমন উজ্জ্বল চন্দ্রালোক বুঝি আর কখনও তিনি দেখেন

নাই। সেই সকল অতীত কথা ভাবিতে ভাবিতে সজল নয়নে তিনি পুনরায় শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রি শেষ প্রহরে বালক চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তখন ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি স্বল্পপরিমাণে উদ্দীপক ঔষধ বালককে খাওয়াইলেন। তাহা খাইয়া বালক বলিল, "বাবা, একবার সুধীরকে ডাকিয়া পাঠাও।" সুধীরের বাটী বেশীদূর ছিল না। কৃষ্ণমোহনবাবু তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। বালক ডাকিতেছে শুনিয়া সুধীর অনতিবিলম্বে উপস্থিত হইল। সে যখন আসিয়া পৌছিল, তখন বালকের জীবন নিঃশেষিততৈল প্রদীপের ন্যায় ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছিল। চেষ্টা করিয়া করিয়া বালক বলিতে লাগিল, "ভাই সুধীর, আমি চলিলাম। যাইবার সময় তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আমার অত্যন্ত সুখ হইল। মাষ্টার মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইও, ক্লাসের ছেলেদের বলিও তাহাদের স্নেহ মনে করিয়া আমার শেষ মুহূর্ত্ত সুখকর হইয়াছিল। প্রাণের ভাই সুধীর, তবে আসি। বাবা, তোমার পায়ের ধূলা দাও। আমার জন্য বেশী অধীর হইও না। আমার কোনও কষ্ট নাই। আমি মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইতেছি। ওই আমার মা আসিতেছে। এই যে যাই মা।"

সূর্য্যদেবের পুরোগামী আলোকপ্রবাহে যখন পূর্ব্বদিক্‌প্রান্ত অরুণ বরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং নিদ্রোত্থিত পক্ষিকুলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠধ্বনিতে যখন আকাশ বায়ু আন্দোলিত হইতেছিল, সেই সময়,—যখন রজনীর অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা দূর হইয়াছে অথচ দিবসের প্রখর আলোক ও কোলাহল আরম্ভ হয় নাই,—সেই শান্ত পবিত্র মুহূর্ত্তে বালক তাহার স্নেহময় পিতা এবং শৈশব কোমল বালকবন্ধুর হৃদয় অসীম শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া চির-নিদ্রাভিভূত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণমোহন বাবু

পুত্রের মৃত্যুতে কৃষ্ণমোহনবাবুর সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি পুত্রের মুখ চাহিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাহার জন্যই তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন। সেই পুত্রই যখন অকালে মানবলীলা সংবরণ করিল, তখন তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদ এবং অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া আর কি হইবে? মালপত্র বিক্রয় করিয়া তিনি কারবার বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। কিছু জমি করিয়াছিলেন, তাহা এবং কাশীর সুন্দর প্রাসাদ উপস্থিত যে মূল্য হইল তাহাতেই বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রথমে হিমালয়ের শিখরমালা অতিক্রম করিয়া বদ্রিনারায়ণ দর্শন করিতে গেলেন। তাহার পর প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, জগন্নাথ, কঞ্জিভরম, মাদুরা, সেতুবন্ধ একে একে সকল তীর্থ দর্শন করিলেন। এই তীর্থ-ভ্রমণে তিনি কত নদী পর্ব্বত অরণ্য, কত বিশাল প্রান্তর এবং অপরিচিত জনপদ অতিক্রম করিলেন। অন্তহীন শুভ্র-তুষার-মণ্ডিত শৈল-শিখর-শ্রেণী, পার্ব্বত্য প্রদেশের গভীর নিস্তব্ধতা, সমুদ্রের অবিরাম গর্জ্জন এবং তাহার দিগন্তব্যাপী সৌরকর সমুজ্জ্বল নীল-জলরাশি, তীর্থ-যাত্রিদের ভক্তিব্যাকুল ভাব,—এই সকল দেখিয়া তাঁহার

হৃদয় কিছু স্থির হইল। তিনি স্থির করিলেন জীবনের অবশিষ্ট অংশ নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিবেন।

সংসার হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে হইল আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে কাহাদের অবস্থা বিশেষ দরিদ্র তাহা একবার সন্ধান লইয়া অভাবানুসারে তাহাদের কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন। বহুদিন তিনি দেশে আসেন নাই। এক্ষণে আসিয়া দেখিলেন তাঁহাদের গ্রামের অবস্থার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শৈশবে যাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন তাহারা আজ কোথায়? জীবনের কঠোর তাড়নে দূর-দূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুই চারিজন যাহারা রহিয়াছে তাহাদিগকে চেনা যায় না। যে গৃহগুলির সহিত শৈশবের সুমধুর স্মৃতি বিজড়িত ছিল, সেগুলি আজ পরিত্যক্ত, জঙ্গলে পরিপূর্ণ,—দেখিলে হৃদয় অবসাদে পরিপূর্ণ হয়। বালকেরা পথের ধারে খেলা করিতেছিল। অপরিচিত লোক দেখিয়া তাহারা চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণমোহনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, একদিন তিনিও বালকদের ন্যায় এই পথের ধারেই খেলা করিয়াছিলেন।

তিনি যাহাদিগকে দরিদ্র দেখিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিলেন। কাহারও উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ পাইতেছে না, তাহাদের কাহাকেও দোকান করিয়া দিলেন, কাহাকেও কলের তাঁত বা মোজা ও গেঞ্জি বুনিবার কল কিনিয়া দিলেন। বিধবা-দিগকে সেলাইয়ের কল দিলেন। এই ভাবে দরিদ্র আত্মীয়দের বর্ত্তমান অভাব ঘুচাইয়া ভবিষ্যতের সংস্থানের উপায় যতদূর সম্ভব বিধান করিলেন।

কৃষ্ণমোহনবাবুর মনে পড়িল বাল্যকালে তিনি মামাবাড়ীতে তাঁহার এক মাসীর কন্যার সহিত খেলা করিতেন, তাহার নাম ছিল লীলা।

বড় হইয়া লীলার সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই। তিনি সংবাদ লইয়াছিলেন একটী পুত্র রাখিয়া লীলা স্বর্গারোহণ করিয়াছে। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন বালকটির পিতাও অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন এবং সে এক্ষণে কাটোয়াতে পিতৃব্যের গৃহে পালিত হইতেছে। লীলাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহার পুত্র এক্ষণে কি অবস্থায় আছে তাহা নিজে গিয়া দেখিয়া আসিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। বালকের পিতৃব্যের ঠিকানা লইয়া তিনি তাঁহার বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই পিতৃব্যই পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত সুরেশবাবু।

সেদিন শনিবার। বেলা চারটা বাজিয়া গিয়াছিল। লংক্লথের পাঞ্জাবীর উপর কাঁধে একটী চাদর ফেলিয়া একটী মোটা লাঠি হাতে কৃষ্ণমোহনবাবু সুরেশচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি ডাকিতে যাইতেছেন, এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে একজন চাকর সবেগে দৌড়িয়া আসিল এবং তাহার পর একটী বালক এক্পাটি জুতা হাতে করিয়া চাকরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাহির হইল। অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে পড়াতে বালক কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, এবং ছুটিয়া গিয়া হস্তস্থিত জুতা নিক্ষেপ করিয়া চাকরকে প্রহার করিল। এই ভাবে ক্রোধের উপশম হইলে পর বালক বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বালক ফিরিয়া আসিলে কৃষ্ণমোহনবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাহার নাম অনুকূল চন্দ্র, সে সুরেশবাবুর পুত্র। সুনীতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে একদিন রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদে কৃষ্ণমোহনবাবু অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এই বিশাল জগতের মধ্যে কি করিয়া তিনি এই

নিরুদ্দিষ্ট বালককে খুঁজিয়া বাহির করিবেন? সুরেশবাবু তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এই ভাবিয়া তিনি সুরেশবাবুর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

সুরেশবাবুর বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। কৃষ্ণমোহন বাবু উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর নিজের পরিচয় দিয়া সংক্ষেপে তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। সুনীতির নাম শুনিয়া সুরেশবাবু কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সুনীতি, তুই এখন কোথায় আছিস্ বাবা? যেখানেই থাক্ আশা করি এখানকার চেয়ে ভাল আছিস্।" কৃষ্ণমোহন বাবুর নিকট তিনি সুনীতির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, এমন মধুর স্বভাবের বালক তিনি কখনও দেখেন নাই। কখনও কোনও কারণে তাহাকে বিরক্ত হইতে বা রাগ করিতে দেখেন নাই। তাঁহার বাড়ী হইতে পলাইয়া যাওয়াতে তাহার যে কোনও দোষ নাই একথাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, "তাহার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তাহাকে যদি পাইতাম, তাহা হইলে আর বাড়ীতে থাকিতে বলিতাম না। কোনও একটা ভাল যায়গায় স্কুলের ছাত্রাবাসে রাখিয়া পড়াইতাম। কিন্তু তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

"তাহার সংবাদ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলাম। আজ কিছুদিন হইল তাহার এক পত্রে সে ভাল আছে জানিয়া কিছু আশ্বস্ত হইয়াছি। পত্র কলিকাতা হইতে আসিতেছে, কিন্তু ঠিকানা দেওয়া নাই। কলিকাতার জন-সমুদ্রের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, তথাপি আপনি যদি তাহার অনুসন্ধান করিতে চান, তাহা হইলে একবার কলিকাতা যাইতে পারেন।"

কৃষ্ণমোহন বাবু বলিলেন, "অবশ্য যাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার পত্রখানি একবার লইয়া আসুন।"

সুরেশবাবু পত্রখানি আনিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

"শ্রীচরণেষু—

আমি ভাল আছি। আপনারা আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আপনি কাকীমা ও অনুকূল দাদা আমার প্রণাম জানিবেন, খুকীকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন।

আপনারা কি আমাকে ক্ষমা করিবেন না?

আপনাদের অকৃতজ্ঞ সন্তান—

সুনীতি।"

কৃষ্ণমোহন বাবু পত্র ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন খামের উপর বৌবাজার পোষ্ট আফিসের ছাপ রহিয়াছে। তিনি সুরেশবাবুকে বলিলেন, "এই পত্রখানি দ্বারা আমার অনুসন্ধানের সুবিধা হইতে পারে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এখানি আমার নিকট রাখিতে দেন তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

সুরেশবাবু সম্মত হইলেন।

সুরেশবাবুর অনুরোধে কৃষ্ণমোহনবাবু সে রাত্রি তাঁহার বাটীতে যাপন করিলেন। পরদিন আহারাদি সমাপন করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
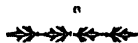
ছাত্রজীবন।

বেলা একটা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, চারিটা বাজিয়া গেল, এখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। কলিকাতার রাস্তাগুলি জলমগ্ন হইয়া ছোট ছোট নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। ট্রাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লোক চলাচলও বিরল। কদাচিৎ দুই একটী ভদ্র লোক জুতা হাতে করিয়া রাস্তার জল ভাঙ্গিয়া চলিতেছেন। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানেরা মুহুর্মুহু কণ্ঠধ্বনি, পদাঘাতের শব্দ, এবং চাবুকের সদ্ব্যবহার এই ত্রিবিধ উপায়ে কোনও ক্রমে জলপথে গাড়ী চালাইতেছে। বৃক্ষের উপর বায়স-কুল ভিজিতেছে, মধ্যে মধ্যে পাখা ঝাড়া দিয়া এবং কা কা শব্দ করিয়া প্রকৃতির এই অভদ্র ব্যবহারে নিরতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। অস্পষ্ট শুভ্র আবরণে আকাশের নীলিমা আচ্ছাদিত হইয়াছে।

ঢং ঢং করিয়া স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজিল। অন্যদিন হইলে বালকেরা সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইত। আজ তাহারা পথে বাহির হইতে না পারিয়া স্কুলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কলরব করিতে লাগিল, কেহ কেহ অগণিত সৌধসঙ্কুল মহানগরীর দৃশ্য দেখিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তথাপি বৃষ্টি ছাড়িল না। তখন দুই একটী করিয়া ছেলে বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল।

সুনীতি এই স্কুলে পড়িত। বৃষ্টি থামিবার পূর্ব্বেই সে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পুরাতন ছাতায় দুই চারি স্থানে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। তাই আজ প্রবল বর্ষণের হাত হইতে সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন জামা ও কাপড় একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সে নীচের ঘরে বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছে এমন সময় মৃন্ময়ী ঘরে ঢুকিল। সুনীতির অবস্থা দেখিয়া সে বলিল, "ওমা, মাষ্টার ম'শায় যে একেবারে নেয়ে এসেছেন।" ঘরের একপাশে শীঘ্র শুকাইবে বলিয়া সুনীতি ছাতা খুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া মৃন্ময়ী একদৌড়ে মায়ের নিকট গিয়া বলিল, "মা, মাষ্টার ম'শায়ের ছাতা ছিঁড়ে গেছে। আজ স্কুল থেকে আস্‌তে আস্‌তে একেবারে ভিজে গেছেন।" কিছুক্ষণ পরে সুনীতি যখন খাবার খাইতে গেল, তখন অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা, তোমার ছাতা ছিঁড়ে গেছে, আমাকে বল্‌তে নেই? বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে অসুখ কর্ব্বে। তোমার মা যদি থাকৃতেন, তাঁকে কি বল্‌তে না?" সুনীতি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল। যখন সে খাবার খাইয়া উঠিয়া গেল, তখন অন্নপূর্ণা তাহাকে একটী ছাতার মূল্য দিয়া ছাতা কিনিয়া লইতে বলিলেন।

সন্ধ্যার সময় বিন্দুমাধববাবু অফিস হইতে ফিরিলেন। তিনি পোষাক ছাড়িতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পাখা হাতে করিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে সুনীতির কথা তুলিয়া বলিলেন, "ছেলেটির কি সুন্দর ব্যবহার! আহা এমন ছেলেকেও তাহার খুড়ীমা তাড়না করিত?"

বিন্দুমাধববাবু বলিলেন, "ছেলেটি খুব ভাল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কোন জিনিষের দরকার হইলেও বলে না অমুক জিনিষটি চাই। যতক্ষণ না আমরা আপনা হইতে দিই ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। আজ মিনু বলিল, 'মা, মাষ্টার ম'শায়ের ছাতাটি ছিঁড়ে

গেছে। আজ ইস্কুল থেকে আস্‌বার সময় একেবারে ভিজে গেছেন।' আমি ছাতাটি এনে দেখ্‌লাম, শতধা হ'য়ে ছিঁড়ে গেছে। আর কেউ হ'লে এমন ছাতা নিয়ে ইস্কুল যেতে লজ্জা কর্‌ত। আজ তা'কে একটি ছাতা কিনিবার দাম দিলাম, ছেলেটি কত সঙ্কোচ ক'রে নিল।"

বিন্দুমাধববাবু বলিলেন, "ব্যবহার যেমন সুন্দর লেখাপড়াতেও তেমনি ভাল। ওদের ক্লাসের মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বল্‌লেন এমন ছেলে প্রায় দেখ্‌তে পান না।"

পরের বৎসর সুনীতি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিল। পরীক্ষাতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ২০৲ বৃত্তি পাইল। ইহাতে সকলেই বিশেষরূপে আনন্দিত হইলেন। বিন্দুমাধববাবু সুনীতিকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

প্রথম যেদিন অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বৃত্তির টাকা রাখিয়া সুনীতি তাঁহাকে প্রণাম করিল, সেদিন অন্নপূর্ণার চক্ষু দুইটি আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে সুনীতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি ভাবিলেন, "হায় আজ যদি সুনীতির মা বাঁচিয়া থাকিতেন।"

বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া সুনীতি কিছুক্ষণ বিন্দুমাধববাবুর ছেলেকে পড়াইত। একদিন বৈকালে সুনীতি ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় মৃন্ময়ী আসিয়া বলিল, "মাষ্টার ম'শায় খোকা আজ কিছুতেই পড়িতে আসিল না।"

সুনীতি। আজ তাহা হইলে আমার ছুটি।

মৃন্ময়ী। ছুটি নয়, আজ আমাকে পড়াতে হবে।

সু। তোমার আর পড়ার কথা বলিও না। তোমার লেখাপড়ায় যা মন। এতদিনেও থার্ডবুক শেষ করিতে পারিলে না। আধ ঘণ্টা পড়্‌তে না পড়তেই বই বন্ধ করে তুমি গল্প শোনবার জন্য অস্থির হয়ে পড়।

মৃ। গল্প শোনা বুঝি বড় খারাপ। বইয়ের গল্প যদি সব আপনার কাছে শুনতে পাই, তাহ'লে আর লেখাপড়া শেখার দরকার?—আজ কসেটির গল্প আরও খানিকটা বল্‌তে হবে। সেই দুষ্ট হোটেলওয়ালা আর তার স্ত্রী মেয়েটির উপর অত্যাচার কর্‌ত। তারপর কি হ'ল বলুন।

সু। আজ আর হবে না। আর একদিন বল্‌ব।

অভিমানে মৃন্ময়ীর ঠোঁট দুটি ফুলিতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া সুনীতি তাহাকে গল্প বলিয়া মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিল।

এরকম আবদার নূতন নয়। মৃন্ময়ী সুনীতির নিকট গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিত। মৃন্ময়ী পিতামাতার আদরের কন্যা। তাহাকে সন্তুষ্ট করিলে উঁহারা উভয়েই সুখী হন। সেইজন্য সুনীতি প্রায়ই মৃন্ময়ীর অনুরোধ রক্ষা করিত। সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক হইতে ভাল-ভাল কয়েকটি গল্প সে মৃন্ময়ীকে শুনাইয়াছিল। কিছুদিন হইতে সে 'লে-মিজারেব্‌ল্‌' এর গল্পাংশ তাহাকে সংক্ষেপে বলিতেছিল।

সুনীতি গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। মৃন্ময়ী জানালার পাশে বসিয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিপিন নামক একটী বালক আসিল। বিপিনদের বাড়ী ঐ পাড়াতেই। বিপিন সুনীতির সহিত এক ক্লাসে পড়িত। বিপিন আসিলে পর সুনীতি ও বিপিন তাহাদের ক্লাসের গল্প করিতে লাগিল। বিপিন বলিল, "দেখিলে ভাই অরুণের অন্যায়। পণ্ডিত ম'শাইকে আজ কি রকম ঠাট্টা কল্লে। পণ্ডিত ম'শাই ভাল ইংরাজী জানেন না বলিয়া ক্লাসের দুষ্ট ছেলেরা যেন কি পেয়ে বসেছে। অথচ তাঁহার মত ভদ্রলোক আমাদের কলেজে আর একটী নাই। তাঁর যদি কোনও দোষ থাকে তাহ'লে সে এই যে তিনি বড় বেশী ভালমানুষ।"

সু। হ্যাঁ, আমি ত একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। পণ্ডিত

ম'শাইকে ও fool (ফুল) বলা হ'ল। আমার ধারণা ছিল যে অরুণ যখন লেখাপড়ায় এত ভাল তখন ব্যবহারও ভাল হবে।

বি। ছাই ব্যবহার। ভাল পাশ করে অরুণের ভয়ানক অহঙ্কার হয়েছে। আর কতকগুলো ছেলে জুটেছে তারা সর্ব্বদা ওর খোসামোদ করে একেবারে আকাশে তুলে দিয়েছে। পণ্ডিত ম'শায় আজকার ব্যাপার প্রিন্সিপ্যালকে বলে দেন, তা হ'লে ও ঠিক জব্দ হয়। কিন্তু তা ত পণ্ডিত ম'শায় কখনও করেন না।

তাহার পর তাহারা বেড়াইতে বাহির হইল। মৃন্ময়ী বলিল, "বিপিন দাদা, আজ আমাকে গল্প শুনিতে দিলে না। এই রবিবার দুটা নূতন গল্প বল্‌তে হবে।"

বিপিন হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, বলা যাবে এখন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা।

একদিন সন্ধ্যার পর সুনীতির পড়িবার ঘরে, সুনীতি ও বিপিন বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময়ে খোকা আসিয়া তাহাদের হাতে দুইখানি পত্র দিয়া প্রস্থান করিল। হলুদে রংয়ের খাম, তাহার উপর, বড় বড় করিয়া "শুভ-বিবাহ" এই কয়টি কথা লেখা আছে। কৌতূহলবশতঃ উভয়ে আবরণ ছিঁড়িয়া তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত পত্র দেখিতে পাইল।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

অদ্য সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আমার কন্যা শ্রীমতী প্রভাদেবীর সহিত ১৭নং বিনোদ হালদার ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীমতী খুকীদেবীর পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রকুমার বাবাজীবনের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইবে।. অতএব মহাশয় সবান্ধবে মদীয় দোতালার খেলাঘরে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করাইবেন। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি ৭ই অগ্রহায়ণ সন— সাল।

বিনীতা

শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী।

পুঃ—লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পত্র পাইয়া দুইজনে অনেকক্ষণ হাসিতে লাগিল। ৭॥টা বাজিতে বেশী দেরী ছিল না। অতএব উভয়ে দোতালার খেলাঘরের "বিবাহ-সভায়" উপস্থিত হইল। বিপিন মৃন্ময়ীর মাতাকে প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "এস বাবা। তোমাদের সব নিমন্ত্রণ হয়েছে বুঝি।"

খেলা-ঘরটি ফুল পাতা, লাল নীল কাগজের শিকল, জাপানী আলো প্রভৃতি দিয়া সাজান হইয়াছিল। দরজার উপর একটী পত্রপুষ্প-বিরচিত গেট হইয়াছিল। তাহার উপরে "স্বাগত" ও "বন্দে-মাতরম্" লেখা ছিল। ঘরের মধ্যে বিবাহের যৌতুক সাজান ছিল—একটী খেলনার খাট, তাহাতে তদুপযোগী লেপ, বালিশ, মশারি, গায়ের লেপ সমস্ত

সম্পূর্ণ। পাড়ার অনেকগুলি ছোট খাট ছেলেমেয়ে একত্র হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে বর উপস্থিত হইল। সমাগত বালিকাগণ হুলুধ্বনি করিয়া বরের অভ্যর্থনা করিল। যথাশাস্ত্র শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। তারপরে সকলে আহার করিতে বসিল। বলা বাহুল্য, আহারের আয়োজন রীতিমতই হইয়াছিল।

এইভাবে বিন্দুমাধববাবুর আশ্রয়ে সুনীতির দিন কাটিতে লাগিল।

গ্রীষ্মকাল। পরীক্ষা অতি সন্নিকট। পড়ার চাপে সুনীতির বেড়াইতে যাইবার পর্য্যন্ত সময় নাই। কয়েকদিন অসুখ হওয়ায় পড়ার বড় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। বেশী করিয়া পরিশ্রম করিয়া এক্ষণে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে হইতেছে। বৈকালের নিয়মিত বেড়ানর পর সুনীতি দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিতেছিল। পথে কয়েকটি লোক আলো লইয়া কি খুঁজিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া সুনীতি শুনিল যে একটি দরিদ্র বালকের হাত থেকে একটী সিকি পড়িয়া গিয়াছে। বালক সিকি লইয়া কি কিনিতে যাইতেছিল, হঠাৎ একটী মোটরকারের সাম্‌নে পড়ে। তাড়াতাড়ি সরিতে গিয়া একটী লোকের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া হাত থেকে সিকিটি পড়িয়া গিয়াছে। প্রথমে বালক হাত বুলাইয়া বুলাইয়া খুঁজিতেছিল। তাহার পর নিকটের দোকানী আলো আনিয়া দেখিতে লাগিল। দুই চারিটী লোকও আসিয়া জুটিল। সকলে মিলিয়া খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই সিকিটি পাওয়া গেল না। বালকটি কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িয়াছে। সুনীতি ভাবিল সঙ্গে একটী সিকি থাকিলে তাহাকে দিয়া যাইত। কিন্তু সে খালি হাতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বাড়ীও নেহাৎ কাছে নয়। একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাড়ী চলিল। বাড়ী পৌঁছিয়া তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া আলো জ্বালিয়া সন্ধ্যা করিয়া পড়িতে বসিল।

কিন্তু তাহার পড়াতে ভাল মন বসিল না। কেবল সেই রোরুদ্যমান দরিদ্র বালকের মুখচ্ছবি তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বালক কি তাহার হারাণ সিকি খুঁজিয়া পাইয়াছে? বোধ হয় পায় নাই। সে কি এখনও সেখানে খুঁজিতেছে? এখন যাইলে কি তাহাকে সেখানে পাওয়া যাইবে? বোধ হয়—না। তাহার আসিতে ১৫ মিনিট লাগিয়াছে, বাড়ীতে অনুমান ২০ মিনিট কাটিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া যাইতে আরও ১৫ মিনিট লাগিবে। এই প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরিয়া সেই দরিদ্র বালকটি কি ব্যর্থ অন্বেষণ করিতেছে? বোধ হয় না। হয় ত সে ইতিমধ্যেই চলিয়া গিয়াছে। আর এমনও হইতে পারে যে সুনীতি চলিয়া আসিবার পরে দৈবাৎ সিকিটি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

সুনীতি নূতন উদ্যমে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। আজ ঘণ্টা দুই ভাল করিয়া পড়িতে পারিলে Physicsএর বইখানা শেষ করিতে পারিবে।

কিন্তু আবার সুনীতির মনে হইল, "বোধ হয় এখনও বালক সেখানে বসিয়া কাঁদিতেছে। দরিদ্র বালক—চারি আনা পয়সা কোথা হইতে আসে?"

বই বন্ধ করিয়া সুনীতি উঠিয়া পড়িল। বাক্স খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া চটি পরিয়া বাহির হইল। দূর হইতে দেখিল সেখানে আলো নাই, কিন্তু অস্পষ্ট রোদনধ্বনি যেন তাহার কাণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আর একটু পরেই সুনীতি সেখানে উপস্থিত হইল। দেখিল অন্ধকারে বসিয়া বালক পাগলের ন্যায় চারিদিকে ভূমির উপর হাত বুলাইতেছে, আর মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে। যে দোকানী আলো দেখাইতেছিল সে সিকিটি আর পাওয়া গেল না দেখিয়া আলো লইয়া দোকানে ফিরিয়া গিয়াছে। যাহারা খুঁজিতেছিল তাহারাও একে একে

চলিয়া গিয়াছে। দুই একটী দয়ার্দ্র লোক মিষ্ট কথায় বালককে সান্ত্বনা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বালক কাহারও কথা মানিতেছে না। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে।

বড় বড় জুড়িগাড়ী, মোটরকার রাজপথ আলোকিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে কত লক্ষপতি লোক, যাঁহারা দুই পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাঁহারা যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহও গাড়ী থামাইয়া সেই দরিদ্র বালককে বলিলেন না "বালক, কাঁদিও না। এই তোমার চারি আনা পয়সা নাও।" পথের মধ্যে গাড়ী থামাইয়া দরিদ্র বালকের সহিত কথা বলিলে বোধ হয় তাঁহাদের মর্য্যাদার হানি হইত। এই অমরাবতী তুল্য ঐশ্বর্য্য-শালী নগরের মধ্যে বালক চারি আনা পয়সার জন্য পথের ধূলাতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিল।

সুনীতি বালকের হাত ধরিয়া তুলিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোনও মতে বলিল, "ভাই, কাঁদিও না, এই একটী টাকা নাও।" বালক চিত্রার্পিতের ন্যায় টাকা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটী কৃতজ্ঞতার কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। শুধু অশ্রু পরিপ্লুত বড় বড় চক্ষু দুইটি সুনীতির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

এই সময়ে একটী প্রবীণ লোক রাস্তায় গোলমাল দেখিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দুই একজন দর্শকের নিকট অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন। অতঃপর এই দয়ার্দ্র বালকটি কি করে ইহা জানিতে তাঁহার কৌতূহল হইল, তিনি নিকটে থাকিয়া সমস্তই দেখিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

হারানিধি।

বালকটি একটু সুস্থির হইলে সুনীতি তাহাকে, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

বালক উত্তর করিল, "আমার নাম নারাণ"

সু। তোমার বাপ মা আছেন?

না। আমার বাপ ও সৎমা আছে।

সু। তোমার বাপ কি কাজ করেন?

না। বাবা ছাপাখানায় কাজ করিত। চোখ খারাপ হওয়ায় তাঁর কাজ গেছে। এখন বড় কষ্টে আমাদের দিনপাত হয়।

সুনীতি বলিল, "চল তোমাদের বাড়ী দেখিয়া আসিব।"

নারায়ণ দোকান হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া সুনীতির সহিত বাটী অভিমুখে চলিতে লাগিল। প্রবীণ ভদ্রলোকটি অল্প দূরে থাকিয়া ইহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "পয়সা হারাইয়া গেলে তোমাদের খাইবার কষ্ট হইবে বলিয়া কাঁদিতেছিলে না অন্য কারণ ছিল?"

নারা। আমি সৎমার ভয়ে কাঁদিতেছিলাম। সৎমা আমাকে শুধু শুধুই এত বকে। পয়সা হারাইয়াছি শুনিলে নিশ্চয়ই খুব মারিত।

সু। তোমার নিজের ভাই কি বোন্ আছে ?

না। একটী বোন্ আছে।

ততক্ষণ তাহারা নারায়ণদের ক্ষুদ্র কুটিরের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছিল। ভিতর হইতে স্ত্রীলোকের ক্রুদ্ধস্বর শোনা যাইতেছিল। নারায়ণ বলিল, "ঐ আমার দেরী হইয়াছে বলিয়া মা বক্‌ছে।"

সুনীতি এখানে বালকের নিকট হইতে বিদায় লইল। বলিল, "তোমার কখনও কোনও বিপদ হইলে আমাকে জানাইও।" এই বলিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। অতঃপর সুনীতি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বাড়ী ফিরিল।

যে ভদ্রলোকটী পশ্চাতে আসিতেছিলেন, তিনি সেই সময় সুনীতির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বাবা তোমার নাম কি ?"

সুনীতি নাম বলিল।

নাম শুনিয়া ভদ্রলোক চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, এতদিনে বুঝি আমার কষ্ট সার্থক হইল।

বলা বাহুল্য এই প্রবীণ ভদ্রলোকটী কৃষ্ণমোহনবাবু। বহুদিন হইতে তিনি কলিকাতায় বাসা লইয়া সুনীতির অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

সুনীতির পরিচয় লইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে যাহার জন্য তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এই সেই বালক। মনে মনে তিনি ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। এ বালকটি যে রত্ন বিশেষ।

পরদিন প্রাতে তিনি বিন্দুমাধববাবুর সহিত দেখা করিলেন। স্থির হইল যে পরীক্ষা হইয়া গেলেই সুনীতি তাঁহার বাসায় উঠিয়া আসিবে।

বিন্দুমাধববাবু ও তাঁহার স্ত্রী অতি কষ্টে সুনীতিকে বিদায় দিলেন। স্নেহের শত বন্ধনে সুনীতি যে তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিল।

তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া আসিবার সময় সুনীতির চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে যখন নিরাশ্রয় ছিল তখন ইঁহারা আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং যখন এই বিশাল জগতে তাহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না তখন ইঁহারা অপর্য্যাপ্ত স্নেহধারায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় অভিষিঞ্চন করিয়াছিলেন।

সুনীতি চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিন্দুমাধববাবুর বাটীতে দেখা করিতে যাইত। কৃষ্ণমোহনবাবুও মধ্যে মধ্যে বিন্দুমাধববাবুর পরিবারবর্গকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহারাদি করাইতেন। কৃষ্ণমোহনবাবু ও বিন্দুমাধববাবুর মধ্যে অতিশয় সম্প্রীতি হইল। সুনীতি সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় লেখাপড়া করিতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল।

সুনীতির সংবাদ লিখিয়া কৃষ্ণমোহনবাবু সুনীতির পিতৃব্যের নিকট পত্র লিখিলেন—কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। যখন দুইবার পত্র লিখিয়াও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন কৃষ্ণমোহনবাবু নিজেই কাটোয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। কৃষ্ণমোহনবাবু এ সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সুনীতির জন্য অনুকূল কিম্বা অনুকূলের মাতার কোনও উৎকণ্ঠা থাকিবার কথা নয়, ইহা জানিয়া তিনি অনুকূলকে সুনীতির সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না।

তিনি ফিরিয়া আসিলে সুনীতি তাঁহার নিকট পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইল। তিনি সুনীতির প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিতেন, সুনীতির সেই সব কথাই দিবারাত্র মনে হইত। সেই স্নেহময় মূর্ত্তি সে আর দেখিতে পাইবে না, চিতার আগুনে পুড়িয়া তাহা ছাই হইয়া গিয়াছে, ইহা ভাবিয়া সুনীতির মর্ম্মান্তিক যাতনা হইত। কিছু

দিনের জন্য কলেজের পড়াতে মন দেওয়া তাহার অসম্ভব হইল। কালের প্রভাবে তাহার শোক কিছু শান্ত হইল। তখন সে পুনরায় পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

আসন্ন বিচ্ছেদ।

মৃন্ময়ী এখন বড় হইয়াছে। এখন সে প্রগল্ভ ভাব নাই। সে চঞ্চল গতি, সে উচ্চকণ্ঠে হাস্য, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সুনীতি তাহাদের বাটীতে আসিলে সব সময় তাহার দেখা পায় না। কোনও প্রয়োজনে সুনীতির কাছে আসিতে হইলে আনত বদনে ধীরকুণ্ঠিত পদবিক্ষেপে সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। কোনও দিন হয় ত সুনীতি তাহাদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। পাশের ঘর হইতে দুই একবার তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল মাত্র।

মৃন্ময়ীর বালিকাসুলভ চপলতা আর দেখিতে পাইত না বলিয়া সুনীতির মাঝে মাঝে কষ্ট হইত বটে, কিন্তু মৃন্ময়ীর এই নূতন ভাবও তাহার খুব ভাল লাগিত। যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা প্রভাতের সূর্য্যালোকের ন্যায় তাহার অকুণ্ঠিত বিকাশে চারিদিক প্রফুল্ল করিয়া রাখিত, অথবা পর্ব্বতগাত্রস্থ ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ন্যায় অবিরাম হাস্যকলরবে ক্ষুদ্র গৃহটি মুখরিত করিয়া রাখিত। আর এখন যেন নিদাঘ সন্ধ্যায় প্রস্ফুট কুসুমের সুগন্ধ মাঝে মাঝে মলয় সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে আসি-

তৈছে না, সর্ব্বদা পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই বেশী ভাল লাগিতেছে ; কিংবা যেন নদীর পরপার হইতে আগত বংশীধ্বনি, দূরাগত এবং অস্পষ্ট বলিয়া সমধিক হৃদয়গ্রাহী। সে বালিকার ফুল্লচপলতা ছিল সুন্দর। এ কিশোরীর লজ্জাজড়িত ভাব হইয়াছে মধুর। সে সৌন্দর্য্য চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ মাধুর্য্যের ভিতর নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

সুনীতির কলেজের ছুটি হইয়াছে। সে কৃষ্ণমোহনবাবুর সহিত দক্ষিণ ভারতে বেড়াইতে যাইবে। তাই যাইবার পূর্ব্বে বিন্দুমাধববাবুর বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়াছে। জলখাবার খাইয়া সুনীতি বারাণ্ডার একপাশে বসিয়া খোকার সহিত গল্প করিতেছিল, বারাণ্ডার অপর প্রান্তে মৃন্ময়ী ও তাহার মামাত বোন পান সাজিতেছিল। কাল বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিল, খোকা উৎসাহের সহিত তাহারই বর্ণনা করিতেছিল। সুনীতি খোকার কথা শুনিতেছিল বটে কিন্তু তাহার মন কর্ম্মনিরতা বালিকা দুইটির নিকট পড়িয়াছিল। তাহাদের মৃদু স্বরে গল্প এবং মধ্যে মধ্যে অনুচ্চ হাস্যধ্বনি শোনা যাইতেছিল। একটি ডিবাতে পান ভরিয়া মৃন্ময়ীর মামাত বোন বলিল, “যমুনা ভাই তোর বরকে পান দিয়ে আয় না।”

মৃন্ময়ীর কর্ণমূল রাঙ্গা হইয়া উঠিল। একটী গোটা পান লইয়া সে পরিহাসপ্রিয় ভগিনীকে আঘাত করিয়া বলিল, “যাঃ, আমি কিছুতেই নিয়ে যাব না।”

অপরা কহিল, “ভাল কথা বল্‌লে মার খেতে হয়। তা তোর বরেরই কষ্ট হবে, আমার কি বল্‌?”

এই সময় মৃন্ময়ীর মা আসিয়া বলিলেন, “ও মা, তোমরা এখনও সুনীতিকে পান দাও নাই। কতক্ষণ সে জল খেয়ে বসে আছে।”

তাঁহার ভাই-ঝি সাধু সাজিয়া বলিল, “পিসীমা আমি মিনুকে পান দিয়ে আসতে বল্‌লাম, ত মিনু রাগ করে আমায় মার্‌লে।”

পিসীমা বুঝিলেন অনুরোধটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাষায় করা হয় নাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যাও ত মা, পানের ডিবে দিয়ে এস।" মিনু অগত্যা ডিবে লইয়া উঠিয়া গেল। এইরূপে তাহার পরাজয় সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া তাহার ভগিনী অধর চাপিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল।

মিনুর মা সুনীতির নিকট আসিয়া বলিলেন, "তোমরা কোন্ কোন্ জায়গায় যাবে বাবা?"

সুনীতি কহিল "ত্রিপতি, কাঞ্চী, কুম্ভকোনাম, তাঞ্জোর, মান্দ্রাজ, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম ও রামেশ্বর এই কয়টি জায়গা দেখিব ঠিক করিয়া যাইতেছি। লঙ্কা যাইবারও ইচ্ছা আছে। তাহার পর সুবিধামত অন্য স্থানেও যাওয়া হবে। দক্ষিণে অসংখ্য সুন্দর ও সুবৃহৎ মন্দির আছে। বাঙ্গালীরা এই সব তীর্থস্থানে কদাচিৎ গিয়া থাকে।"

সন্ধ্যার পর সুনীতি উঠিল। বিন্দুমাধববাবু ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া একবার উৎকণ্ঠিত ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু যাহাকে দেখিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহাকে দেখা গেল না। অনেক দিনের জন্য প্রবাসে যাইতেছে, কোথায় কলিকাতা,—কোথায় নীলোর্ম্মিমালা পরিবেষ্টিত সিংহল দ্বীপ। বিদায় মুহূর্ত্তে একবার মৃন্ময়ীর সহিত দেখা করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক হইয়াছিল।

বিষণ্ণ হৃদয়ে সুনীতি সে কক্ষ ত্যাগ করিল। সিঁড়ির নিকট গিয়া দেখিল প্রাঙ্গণের অপর দিকে বারাণ্ডার রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া মৃন্ময়ী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বড় বড় চোখ দুটি মৌন ভাষায় বিদায়ের ব্যাকুল-বার্ত্তা প্রকাশ করিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের চারিচক্ষের মিলন হইল, অমনি মৃন্ময়ীর আঁখিপাতা দুইটি পড়িয়া গেল, সে লজ্জায় মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সুনীতি চলিয়া আসিল।

সেদিন রাত্রে অজ্ঞাত দেশের মধ্য দিয়া ট্রেণ সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। সুনীতি ভাবিতেছিল প্রতিমুহূর্ত্তেই সে মৃন্ময়ীর নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে। রজনী তমোময়ী। একখণ্ড সূক্ষ্ম অলঙ্কারের ন্যায় চন্দ্রকলা আকাশের গায়ে শোভা পাইতেছিল। কয়েকটি পরিচিত নক্ষত্র নৈশ-পবন বিক্ষিপ্ত প্রদীপালোকবৎ অস্থির ভাবে জ্বলিতেছিল। ট্রেণে সকলেই নিদ্রিত। সুনীতি জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। রজনীর অন্ধকারের মধ্যে সে বিদায়ের ব্যাকুলতা মাখা সেই দুইটি চক্ষু দেখিতে পাইতেছিল। সমস্ত আকাশময় ছড়াইয়া পড়িয়া সেই দুইটি চক্ষু যেন স্থির দৃষ্টিতে সুনীতির দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইল যেন সমস্ত প্রকৃতি বিচ্ছেদের ব্যথায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ
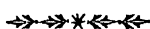
সুনীতির পত্র

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

শ্রীরঙ্গম্,

সোমবার, ১৩ই আশ্বিন ১৩—

প্রিয়বরেষু,

ভাই বিপিন, শুক্রবার অপরাহ্নে আমরা ত্রিচিনাপল্লী-ফোর্ট ষ্টেশনে পৌছিয়াছি। ত্রিচিনাপল্লী এক বিস্তৃত নগরী এখানে তিনটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ত্রিচিনাপল্লী জংসন ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া আমরা

ফোর্ট ষ্টেশনে আসিলাম, কারণ শ্রীরঙ্গম এই ষ্টেশনের কাছে। ষ্টেশন হইতে ঝটকা করিয়া আমরা নগর অভিমুখে চলিলাম। মিশনারী কলেজ ও ছাত্রাবাসের ঊর্দ্ধভাগে এবং তৎসংলগ্ন বৃক্ষগুলির মন্দপবনান্দোলিত পত্রাবলির উপর অস্তোন্মুখ সৌরকিরণমালা প্রতিফলিত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছিল। যুবকগণ টেনিস্ খেলিতেছিল। রাজপথগামী স্ত্রী পুরুষ-গণ বিদেশী দেখিয়া আমাদের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। অনতিকাল পরে আমরা চিনিয়াপিলের ছত্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। ছত্রমটি নূতন তৈয়ার হইয়াছিল। বাড়ীটি দ্বিতল। দেবদেবী ও পরীর বিচিত্র মূর্ত্তি দ্বারা বাহিরটি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে। ছত্রমটি চিত্তা-কর্ষক বলিয়া বোধ হইল।

এখানে আসিয়া শুনিলাম যে ছত্রমে জায়গা হইবে না। দোতালা খালি আছে, কিন্তু গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত উপরের ঘর খোলা হইবে না। অগত্যা আমরা একটা ঝটকা লইয়া গৃহস্বামীর বাটী অভিমুখে চলিলাম।

রাজপথ জনাকীর্ণ। রাস্তার ধারে জলের কল। সেখানে জলার্থিনী তামিল রমণীগণ কলসী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পরিধানে রেশমের রঙ্গীন শাড়ী,—মস্তক অনাবৃত। আমাদের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা ঝটকার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল।

গৃহস্বামীর নির্দ্দেশমত ছত্ররক্ষক উপরের ঘর খুলিয়া দিল। চেয়ার, টেবিল এবং অনেকগুলি চিত্রের দ্বারা গৃহটি সুসজ্জিত ছিল। রাত্রে বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রাতে আমরা শ্রীরঙ্গমের মন্দির দেখিতে চলিলাম।

নগর ছাড়াইয়া আমরা নদীর নিকট উপস্থিত হইলাম। কাবেরীর বিশাল জলধারা কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া তীরবিরাজী ঘন সন্নিবিষ্ট তরু-লতার অধোবিলম্বিত স্নিগ্ধশ্যাম পত্রাবলি প্রায় স্পর্শ করিয়া ছুটিয়া

চলিয়াছে। শ্রীরঙ্গম্ কাবেরীর মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপের আয়তন এত বিশাল, যে মনে হয় ইহা দ্বীপ নহে নদীর পরপার। ত্রিচিনাপল্লী ও শ্রীরঙ্গমের মধ্যে কাবেরী নদীর উপর একটী বৃহৎ সেতু আছে। সেতুর উপর দিয়া আমাদের গাড়ী পরপারে উপস্থিত হইল। দ্বীপের ভূমি অতিশয় উর্ব্বর। নানাজাতীয় বৃক্ষ লতা দ্বীপকে সুশোভিত করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুইচারিটি গৃহ ও পান্থশালা পথ পার্শ্বে দেখা যাইতেছিল। বাটীগুলির উপরে অঙ্কিত ত্রিবন্ধ প্রচার করিতেছিল যে ইহা বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং ত্রিপুণ্ড্র তিলক এই তিনটির চিত্র লইয়া ত্রিবন্ধ রচিত। কিছুক্ষণ পরে আমরা মন্দিরের সুবৃহৎ তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সর্ব্বাপেক্ষা বহিঃস্থ যে উচ্চপ্রাচীর দ্বারা মন্দিরটি বেষ্টিত সেটি দৈর্ঘ্যে দুই মাইলের উপর। এত সুবিস্তীর্ণ মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। তোরণ দ্বার পুষ্পপল্লবে সজ্জিত হইয়াছিল। তাহার মধ্য দিয়া আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উভয় পার্শ্বে বিপণী শ্রেণী সজ্জিত রহিয়াছে। পূজার উপকরণ এবং অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যে বিপণীগুলি পরিপূর্ণ। অল্পদূর অগ্রসর হইয়া আমরা মন্দিরবেষ্টন-কারী দ্বিতীয় প্রাচীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এইরূপ একটীর পর একটী করিয়া সাতটী প্রাচীর অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সুতরাং শ্রীরঙ্গমের মন্দিরকে একটী নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীরের তোরণগুলির উপর যে সকল গোপুরাম্ ছিল সেগুলি কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত। গোপুরাম্গুলি কিন্তু খুব উচ্চ নহে, শিব-কাঞ্চীর গোপুরাম্ এবং তাঞ্জোরের মন্দির এগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ।

শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের বিগ্রহের নাম রঙ্গনাথস্বামী। বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, মাথার উপর অনন্তের সহস্র ফণা শোভা পাইতেছে।

এই শয়ান মূর্ত্তির সম্মুখে স্বর্ণালঙ্কৃত বিষ্ণুর ভোগমূর্ত্তি। পূজা সমাপনান্তে আমরা মন্দিরের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। মূল মন্দিরের সুবর্ণাবৃত শিরোভাগ একস্থান হইতে দেখা যাইতেছিল।

যামুনাচার্য্যের মৃত্যুর পর রামানুজাচার্য্য কাঞ্চী হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ পুণ্যময় জীবনের অধিকাংশ এখানেই অতিবাহিত হয়, এবং এখানে থাকিয়া তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের প্রচারক কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার বসিবার বেদী মন্দির প্রাঙ্গণে এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাবের প্রায় চারিশত বৎসর পরে আর একটী পুণ্যময় মূর্ত্তি শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—ইনি আমাদের বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ শ্রীচৈতন্য দেব। না জানি কোন স্থানে পরম বৈষ্ণব ভেঙ্কটভট্টের আবাস গৃহ ছিল, যেখানে থাকিয়া মহাপ্রভু চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অবস্থান কালে যে দৃশ্য এখানে প্রকটিত হইত তাহা আমি মানসচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই সোনার অঙ্গ ধূলাবলুণ্ঠিত এবং পুলকে কণ্টকিত হইয়াছে। প্রেমাবেশে চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত এবং সেই ফুল্লারবিন্দ সদৃশ নয়ন যুগল হইতে উৎসের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে শুধু হরিনাম। এই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে। লোক আর ধরে না। সেই প্রেম-সিন্ধুর মহাতীর্থে আসিয়া লোকে তাহাদের শূন্য হৃদয়-কুম্ভগুলি প্রেমরসে পূর্ণ করিয়া লইতেছে। এমন দৃশ্য কি আর কখনও পৃথিবীতে ফুটিয়া উঠিবে?

মহাপ্রভুর আর এক লীলার কথা মনে পড়িল। এই মন্দিরে একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া গীতা পাঠ করিতেন। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ। পড়িতে পড়িতে অনেক ভুল করিতেছিলেন, তাহা জানিয়া কেহ উপহাস,

কেহ নিন্দা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের ভ্রূক্ষেপ নাই আবিষ্ট হইয়া আনন্দিত মনে পাঠ করিয়া যাইতেছিলেন।

মহাপ্রভু পুছিল তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জু-ধর।
বসি আছেন তাতে যেন শ্যামল সুন্দর।
অর্জ্জুনেরে কহিছেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পাঠো তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতা পাঠ তোমার অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই ভাবে মহাপ্রভু পাণ্ডিত্যাভিমানীদের নিকট ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের অনতিদূরে একটী শিব-মন্দির আছে, তাহার নাম জম্বুকেশ্বরের মন্দির। এখানে মহাদেবের জলময় লিঙ্গ বিরাজিত— দক্ষিণ ভারতে পাঁচটি তীর্থে মহাদেবের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতময় লিঙ্গ যথাক্রমে বিরাজিত। জম্বুকেশ্বরের মন্দিরটি প্রাচীন। বহু স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের সংস্কার কার্য্য চলিতেছিল। শুনিলাম এক চেটি (বণিক্) সংস্কারের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শ্বেত-প্রস্তরের যে মূর্ত্তিগুলি কারিকরগণ উৎকীর্ণ করিতেছিল সেগুলি প্রাচীন

শিল্পীর কীর্ত্তির পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত। ভুবনেশ্বর, শ্রীরঙ্গম্ ও রামেশ্বরে মন্দির সংস্কার কার্য্য দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে ভারতবর্ষে শিল্পের বর্ত্তমান অবনতির কারণ শিল্পীর অভাব নহে, শিল্পোৎসাহীর অভাব। পূর্ব্বে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া এই সকল কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে কে সেরূপ অর্থব্যয় করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছে?

ভারতের অতীত গৌরবের এই সকল নিদর্শন দেখিয়া কোন্ হিন্দুর হৃদয় উল্লসিত না হয়? এত অজস্র অর্থব্যয়, এত শ্রম, এত অধ্যবসায় সকলই ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা ঈশ্বরের মহিমা প্রচারে নিযুক্ত হইয়া সার্থক হইয়াছে। এই ত ভারতবর্ষের প্রাণের কথা।—ভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা নিয়োজিত হয় তাহাই ধন্য, তাহাই মহীয়ান্। নহিলে ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, সকলই তুচ্ছ, সকলই ব্যর্থ।

পাশ্চাত্য জগতের কৃতিত্ব কোথায়? ঐ দেখ তাহাদের রেল, ষ্টীমার, মোটর গাড়ী, ঐ দেখ তাহাদের কারখানা, লক্ষ লক্ষ লোক খাটিতেছে, সহস্র সহস্র কল ঘুরিতেছে—কোথাও কাপড় তৈয়ার হইতেছে, কোথাও বন্দুক, গোলা, বারুদ তৈয়ার হইতেছে। দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয় বটে, কিন্তু এ সকল কিসের জন্য? এত বুদ্ধি, এত কৌশল, এত শক্তির নিয়োগ কি উদ্দেশ্যে? ঐ দেখ প্রতি ঘণ্টায় সহস্র সহস্র কাপড়ের বস্তা কল হইতে বাহির হইতেছে; প্রবল পরাক্রান্ত সুসভ্য বণিক রেল ষ্টীমারের সাহায্যে এই কাপড় পৃথিবীর দূরদূরান্তরে লইয়া যাইতেছে, এবং যেখানে নিভৃত গ্রামপ্রান্তে দীনদরিদ্র তন্তুবায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কোন মতে তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অন্নসংস্থান করিতেছিল সেইখানে এই অল্পায়াস প্রস্তুত কাপড় বিক্রয় করিয়া সেই দরিদ্র তাঁতীর পক্ষে জীবিকা উপার্জ্জন করা অতিশয় কঠিন করিয়াছেন।

ঐ যে কামান-গোলা বন্দুক প্রস্তুত হইতেছে, উহার উদ্দেশ্য—কত সহজে কত বেশী লোক ধ্বংস করিতে পারা যায়! প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর শাসনার্থে এবং প্রয়োজনমত নিরীহ দুর্ব্বল জাতিকে পদদলিত করিবার নিমিত্ত উহার ব্যবহার হয়। পাশ্চাত্য জগতে এত বিজ্ঞানের চর্চ্চায় কি হইতেছে? যাহাদের প্রচুর অর্থ আছে তাহাদের ভূয়সী অর্থবৃদ্ধির উপায় বাহির হইতেছে, দরিদ্রকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সম্পূর্ণভাবে ধনীর অধীন করা হইতেছে এবং যাহাদের অগাধ সম্পত্তি তাহাদের জন্য বিলাসের নিত্য নূতন উপাদান প্রস্তুত হইতেছে।

আর ভারতবর্ষের প্রাণ কোথায়? কিসের নামে ভারতের কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়? ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ কোন্ নামে মাতিয়া উঠে? ভারতের ঐশ্বর্য্য, ভারতের অধ্যবসায়, ভারতের প্রতিভা কোথায় নিযুক্ত হইয়াছে? কাশীতে যাও, পুরীতে যাও, রামেশ্বরে যাও, বদ্রিনাথে যাও—দেখিতে পাইবে। ঐ দেখ নদীর তীরে—পর্ব্বতের চূড়ায়—নীলোর্ম্মিবিধৌত সমুদ্রের তটে অসংখ্য দেব-মন্দির। ঐ দেখ কুম্ভমেলায়, রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ যাত্রিসমাগম। উহাদের মুখে কি গভীর ভক্তি, কি তীব্র অনুরাগের চিহ্ন প্রকটিত। কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান নাই, লাঞ্ছনায় ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাদের মন ভগবচ্চিন্তায় বিভোর—এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে তাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত নহে। ভারতবর্ষের প্রাণ দেখিতে চাও, এই সকল দেখ, আর দেখ ঐ উপনিষদ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত। আর তোমার মানস-নেত্রে চাহিয়া দেখ—ঐ দেখ জ্ঞানাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য যিনি সকল কর্ম্ম খণ্ডন করিয়া তাঁহার পুণ্য-কর্ম্মে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, ঐ দেখ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যিনি হরিনামে আপনি পাগল হইয়া দেশশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গম্ ও জম্বুকেশ্বরের মন্দির দেখিয়া অপরাহ্নে আমরা ছত্রমে ফিরিয়া আসিলাম। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে ত্রিচিনাপল্লীর শ্রেণীবদ্ধ গৃহগুলি দীপ্তি পাইতেছিল। তাহাদের মধ্য হইতে ফোর্টের অভ্রভেদী পাহাড়টি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দিন আর কোথাও বাহির হই নাই। কাল সকালে ফোর্টের পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম। পাহাড়টি খুব খাড়া, উঠিতে যথেষ্ট পরিশ্রম হইল। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠিয়া শ্রম সার্থক বোধ হইল। শীতল স্নিগ্ধ সমীরণ আমাদের ক্লান্ত শরীর জুড়াইয়া দিল। চারিদিকে কি সুন্দর দৃশ্য। পদতলে পিপীলিকার আবাসের ন্যায় দৃশ্যমান গৃহশ্রেণী, অদূরে চিত্রিত নদীর ন্যায় কাবেরীর প্রবাহ, নদীর মধ্যে শ্রীরঙ্গমের বিস্তীর্ণ মন্দির ও গোপুরামগুলি এবং পৃথিবীর প্রান্ত-দেশে গাঢ় নীলবর্ণের প্রলেপের ন্যায় দূরদিগন্তের বনভূমি শোভা পাইতেছিল।

বৈকালে পল্লীদৃশ্য দেখিতে ঝট্‌কায় আরোহণ করিয়া বাহির হইলাম। লোকালয় ছাড়াইয়া প্রথমে ক্ষেত্র, তাহার পর বনভূমি। মধ্যে মধ্যে এক একটি কৃষক-পল্লী। ঝট্‌কা দ্রুতগতিতে চলিল। আমরা অনেকখানি পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম। তাহার পর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র স্রোত-স্বিনী দেখিতে পাইলাম। স্রোতের নিকটে আসিয়া আমাদের ঝট্‌কা দাঁড়াইল।

তখন সূর্য্যের তেজ পড়িয়া গিয়াছে। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ সমীর নদী-জল তরঙ্গায়িত করিয়া আমাদের শরীর স্পর্শ করিতেছিল। আমরা তীরে ঘাসের উপর বসিয়া সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম

বৃক্ষখচিত তীরভূমি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া নদীর ক্ষীণ জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। মেয়েরা গাত্র ধৌত করিতেছে ও কুম্ভপূরণ করিতেছে। কোথাও বা রজক

কাপড় কাচিতেছে। ওপারে ইষ্টক-ক্ষেত্র; কুলি মজুর কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। এ দিকে বাজারে স্বল্প পরিসর রাস্তার উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র পুরাতন বাটীগুলি। সেখানে লোকজন কেনা বেচা করিতেছে। কেহ কেহ বা ঝগড়া করিতেছে।

প্রথমে মনে হইল কি সঙ্কীর্ণ ধারায় ইহাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। রেল, টেলিগ্রাফ, খবরের কাগজের বহুদূরে অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লী! পৃথিবীর বড় বড় ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! নিজের ক্ষুদ্র দৈনন্দিন জীবনেই আবদ্ধ! কিন্তু কিছুক্ষণ ভাবিবার পর আমার মনে হইল, না তাহা নহে। সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে যে সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন হয়—কোথায় কোন রাজায় রাজায় স্বার্থঘটিত দ্বন্দ্ব, কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির বড়লোক হইবার চেষ্টা, নূতন বিলাসোপকরণের আবিষ্কার—তাহাদের গৌরব কি এই ক্ষুদ্র পল্লীর ঘটনা অপেক্ষা বেশী? এখানকার এই আড়ম্বরবিহীন দৃশ্যগুলিও ত সেই পরমপিতার নয়ন সমক্ষে অভিনীত হইতেছে এবং তাঁহার হৃদয় দিয়া অনুভূত হইতেছে। ইহারা কি ব্যর্থ হইতে পারে?

নিকটে একটী ছোট মন্দির দেখা যাইতেছিল। আমরা সেখানে গেলাম। বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের একটী ভদ্রলোকের সহিত সেখানে দেখা হইল। আমাদের বাঙ্গালী পরিচ্ছদ দেখিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম—এত সহজ অথচ সুন্দর ভাষায় তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে মন্দিরটী তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদূরে ক্ষুদ্র কুটিরে তাঁহার পরিবারবর্গ বাস করে। তাঁহার নির্দ্দেশ ক্রমে আমরা একটী ছোট কুটির দেখিতে পাইলাম, কুটিরের সংলগ্ন বাগানে দুই

তিনটি ছোট ছোট বালক বালিকা খেলা করিতেছে—যেন একটী সরলতা ও পবিত্রতার ছবি আমাদের নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "পূর্ব্বে আমি কর্ম্মোপলক্ষে বাঙ্গলাদেশে ছিলাম। বাঙ্গলাদেশ আমি খুব ভালবাসি। সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। আমি শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপে প্রায় যাইতাম। শ্রীচৈতন্যকে আমি অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি। এই মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণ রাধিকা ও শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছি।" আমরা মন্দিরমধ্যে বিগ্রহ দর্শন করিলাম। তাহার পর তিনি তাঁহার বাটীতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। একখানি ছোট ঘরে ইংরাজী ও সংস্কৃত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সংগ্রহ রাখিয়াছেন। পুস্তকগুলি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিষয়ক। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বাঙ্গলা পড়িতে জানেন?" তিনি বলিলেন, "বাঙ্গলা দেশে থাকিতে অল্প অল্প শিখিয়াছিলাম, এবং একজন শিক্ষকের সাহায্যে এই দুইখানি গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন গৌরাঙ্গের নাম ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আরও প্রচার করা উচিত। তিনি তামিল ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন, অনেকটা শিশির ঘোষের Lord Gaurangaর অনুসরণে। তাঁহার ইচ্ছা আছে চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থের তামিল অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। তাঁহার সহিত আরও অনেক গল্প হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি রেলওয়ের উচ্চ বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলাম। আমার একজন অধস্তন কর্ম্মচারী অনবধানবশতঃ একটা দোষ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার ফলে রেলওয়ের কিছু গুরুতর লোকসান হইয়া যায়। এবিষয়ে আমাকে report (রিপোর্ট) পাঠাইতে হইল। তাহাতে আমার নিজের যে সামান্য ক্রটি ছিল তাহা আর উল্লেখ করি নাই, ফলে

সমস্ত দোষ ঐ অধস্তন কর্ম্মচারীর উপর পড়ে এবং তাহার চাকরি যায়। ফল যে এত গুরুতর হইবে তাহা আমি আশঙ্কা করি নাই, ভাবিয়াছিলাম যে বড় জোর ঐ কর্ম্মচারীর অস্থায়িভাবে উন্নতি বন্ধ থাকিবে। যখন সংবাদ আসিল যে তাহার চাকরি গিয়াছে তখন প্রায় রোরুদ্যমান অবস্থায় সে বেচারী আফিস হইতে চলিয়া গেল। তাহার বৃহৎ সংসার,—বিধবা মাতা, একটী বিধবা ভগ্নী, তিন চারিটি কন্যা—মোটে একটী কন্যার বিবাহ দিতে পারিয়াছিল। সে অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টা করিল, কিন্তু সরকারি চাকরি হইতে ডিস্‌মিস্ (dismiss) হইয়াছে বলিয়া কোথাও কাজ পাইল না। বৃহৎ পরিবার লইয়া তাহার দুরবস্থার একশেষ হইল। তাহার উপর একটি মেয়ের বিবাহ আর না দিলেই নয়। অবশেষে একদিন সংবাদ পাইলাম যে বেচারী অনশনক্লিষ্ট পরিবারবর্গের কষ্ট এবং সামাজিক লাঞ্ছনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! আমার মনের মধ্যে কি প্রবল আত্মধিক্কার হইল তাহা আর বলিতে পারি না। আফিসে কাজ করিতে পারিলাম না। বাড়ী চলিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময় একটী পরিচিত কেরাণী লইয়া সেই মৃত্যুস্পৃষ্ট গৃহে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দৈন্য ও শোকের যে ছবি দেখিলাম জীবনে তাহা কখনও ভুলিব না। সেই বিধবা—এই মাত্র যাহার জীবনের সমস্ত সুখ এবং সমস্ত সুখের আশা ভস্মীভূত হইয়াছে—সে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উৎক্রোশ পক্ষিণীর ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল—তাহার ভাষা আমি বুঝি নাই, কিন্তু তাহার প্রতি অক্ষর শেলের ন্যায় আমার বক্ষের অন্তঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। উঃ কি করুণ সে কণ্ঠস্বর! দুই চারিটি প্রতিবেশিনী সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। একটী ছোট মেয়ে—৮।৯ বছরের বেশী বয়স হইবে না—তাহার পরিধানের বস্ত্র মলিন ও ছিন্ন, কেশ রুক্ষ ও গণ্ডদ্বয়

অশ্রুপ্লুত, অনশন ক্লেশে তাহার গালের হাড় বাহির হইয়া গিয়াছিল, বড় বড় চোখ দুটি কাঁদিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছিল; সে মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া অস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল 'মা' 'মা' এই শব্দ করিতেছিল। এই সময় যাহারা শবদাহ করিতে গিয়াছিল তাহারা ঘরে ফিরিল। তাহাদিগকে দেখিয়া সে বিধবা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, দুই চারিজন বলিষ্ঠ লোকেও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সে দৃশ্য দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, আমি আর থাকিতে পারিলাম না। যে কেরাণীটি আমার সঙ্গে গিয়াছিল তাহার হাতে ইহাদের সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

"আমি মন কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলাম না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য আমিই দায়ী। আমি মিথ্যা কথা বলি নাই বটে, কিন্তু যে সামান্য সত্য গোপন করিয়াছিলাম, তাহাই মিথ্যা এবং এক্ষেত্রে সাঙ্ঘাতিক মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সত্য গোপন না করিলে কিছু দোষ আমার উপর আসিত, আমার আর কি হইত? সামান্য ভৎর্সনা মাত্র, কিন্তু ইহার চাকরি আর যাইত না, এ দরিদ্র পরিবারের এত কষ্ট এবং পরিণামে এ শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটিত না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, কেন আমি এরূপ সত্য গোপন করিলাম। পাঠ্যাবস্থায় ত আমি সত্যপ্রিয় ছিলাম, মাষ্টারের নিকট মার খাইয়াছি তবুও মিথ্যা কথা বলি নাই। পরের দুঃখ দেখিলেও হৃদয়ে বড় কষ্ট হইত—মনে আছে একদিন রাস্তার ধারে একটী তীর্থযাত্রী কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আমি তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসি এবং অভিভাবকদের ঘোরতর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিয়াছিলাম। আমার এরূপ অধঃপতন হইল কেন? আর কিছু নয়, উচ্চ চাকরি করিয়া আমার এক মিথ্যা মর্য্যাদা জ্ঞান হইয়াছে, উপরি-

ওয়ালারা ভর্ৎসনা করিলে মাথা নীচু হইবে, আমার সহকারী কর্ম্মচারীরা আমাকে ছোট মনে করিবে, সেই কল্পিত অপমান এড়াইতে গিয়া আমি দীনদরিদ্র কেরাণীটিকে ঘোরতর বিপদসাগরে ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হই নাই। উঃ কি ভয়ানক অধঃপতন! এত নীচতা স্বীকার করিতেছি কিসের জন্য?—একটি মোটা মাহিনা। কিন্তু টাকা কি আমি এতই ভালবাসি? আমার বিলাস-বাসনা নাই, মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই আমি সন্তুষ্ট। সত্য বটে দুঃখীর দুঃখ-মোচনের জন্য কিছু অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ সংসারে যিনি দুঃখ দিয়াছেন, দুঃখ মোচন করিবার ক্ষমতা তাঁহারই আছে, আমি এই বিশ্বব্যাপী দুঃখের কতটুকু মোচন করিতে পারি? আমার চেষ্টায় কিছু যায় আসে না। এ ঘৃণিত দাসত্ব ছাড়িয়া দিলে ভগবানকে ডাকিবার সময় বেশী পাইব।"

আমি চাকরি ছাড়িয়া দিলাম।

বন্ধুরা বলিলেন মাথা খারাপ হইয়াছে। বড় সাহেব মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?" আমি বলিলাম, "না, কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নাই। চাকরি ভাল লাগিতেছে না, সেইজন্যই ছাড়িলাম।"

মৃত কেরাণীর যে কন্যাটি বড় হইয়াছিল তাহার বিবাহ দিলাম। সে পরিবারের যাহাতে আর বেশী কষ্ট না হয় তাহার জন্য আমি চাকরিতে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশই দান করিলাম। অবশিষ্ট সঞ্চয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে আমি এই দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া এখানে বাস করিতেছি। স্বহস্তে বিগ্রহের সেবা করি। এখানে দরিদ্র কৃষক বালকদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছি। গত মাসে মেলার সময় স্থানীয় যুবকবৃন্দের সাহায্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে

কতকগুলি বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছিলাম। ভগবানের কৃপায় আমার বিনষ্ট শান্তি অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছি।”

সন্ধ্যা হইয়াছিল; ভদ্রলোকটি মন্দিরে আরতি করিতে লাগিলেন। আরতির সময় তাঁহার মুখে ভক্তি ও পবিত্রতার চিহ্ন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। ভদ্রলোক আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। আমরা সেখানে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। ঝট্‌কা দ্রুতগতিতে চলিল। চারিদিক অন্ধকার। আমরা এই ভদ্রলোকটির আশ্চর্য্য জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ ঝট্‌কা থামিতে দেখিলাম, ছত্রমে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

অনেক বেলা হইয়াছে। আজ আসি। সন্ধ্যার গাড়ীতে মান্দ্রাজে ফিরিতে হইবে। মান্দ্রাজের ঠিকানায় পত্র দিও। ইতি

তোমার অভিন্নহৃদয়
সুনীতি

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুনীতির পত্র—পুরী।

শ্রীশ্রীহরিঃশরণং। পুরী

৭ই কার্ত্তিক, ১৩—

প্রিয়বরেষু,

ভাই বিপিন, আমাদের বেড়ান প্রায় শেষ হইয়াছে। আসিবার সময় পুরীতে নামি নাই কারণ পুরী আগে দেখা ছিল। ফিরিবার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া যাইব স্থির করিলাম। পুরী যে হিন্দুর বড় পবিত্র তীর্থ, বাঙ্গালীর বড় আদরের ধন। এ বৎসর এখানে খুব বেশী ভিড় হইয়াছে। বাড়ী পাওয়া খুব কঠিন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সমুদ্রের ধারে একটা ভাল বাড়ী পাইয়াছি। আমি তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। সমুদ্র হইতে প্রভাত-বায়ু আসিয়া আমার শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। আমার সম্মুখে অনন্তবিস্তার নীলোর্ম্মিমালা দূরে অস্পষ্ট দিগন্তে মিশাইয়া গিয়াছে। ঐ জল ফুলিয়া উঠিতেছে—ঐ দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড তরঙ্গের সৃষ্টি হইল—ঐ নীল তরঙ্গের মাথায় শুভ্র ফেনা দেখা দিয়াছে—ঐ ভাঙ্গন ধরিয়াছে—ঐ দেখ বিশাল তরঙ্গটি শুভ্র ফেনারাশিতে পরিণত হইয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেন অতি বাড় বাড়িয়াছিল বলিয়াই তাহার এই পরিণাম। মেঘের গর্জ্জন, জল-প্রপাতধ্বনি এবং ঝড়ের শব্দ এই তিনটি মিশাইলে যেরূপ শব্দ হয়—দিবারাত্র সেইরূপ শব্দ হইতেছে। জেলে ডিঙ্গিগুলি মাছ ধরিয়া কৌশলে তরঙ্গমালা অতিক্রম

করিয়া তীরে ফিরিতেছে। সামান্য জীবিকা অর্জ্জনের জন্য দরিদ্র লোক-দিগকে কত দুরূহ ও বিপজ্জনক কাজ করিতে হয়! ঐ ভীম-তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের উপর ইহারা ছোট ছোট ডিঙ্গি লইয়া কতদূরে চলিয়া যায়!

পুরীতে জাতিবিচার নাই। মহাপ্রসাদ শূদ্রের নিকট হইতে লইয়া ব্রাহ্মণে ভোজন করিতেছে। বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে অতি প্রত্যূষে মহাপ্রভু শ্রীমন্দির হইতে মহাপ্রসাদ লইয়া গিয়া সার্ব্বভৌমের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এইক্ষণে এই অবস্থায় আপনাকে মহাপ্রসাদ খাইতে হইবে।" কি ভয়ানক কথা! সার্ব্বভৌম মহাপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিবেন, স্নান করিবেন, ধৌত বস্ত্র পরিবেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবেন এইরূপে অন্তরের ও বাহিরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া তাহার পর আহার করিবেন। তাঁহাকে কিনা এখনই খাইতে বলা হইতেছে! কিন্তু আমাদের পাগল সন্ন্যাসী ছাড়িলেন না। জগন্নাথের শ্রীমুখের প্রসাদ, তাহাতে আবার শুচি অশুচি বিচার! এই প্রসাদ এক কণা খাইলে সকল মলিনতা দূর হইয়া যায়। সার্ব্বভৌমকে প্রসাদ খাইতে হইল। এত বড় পণ্ডিতের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিয়াছেন, প্রভুর স্ফূর্ত্তি দেখে কে? ভক্তগণ লইয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন ও মহা আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। ইহার অর্থ এই যে ভগবানের কাছে পৌঁছিতে পারিলে আর বিচার থাকে না। তোমার মনে থাকিতে পারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীকে ডাকিয়া বলিতেন, "এই নাও মা তোমার শুচি এই নাও তোমার অশুচি, এই নাও তোমার পাপ এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার বৈরাগ্য এই নাও তোমার সন্ন্যাস—আমি তোমাকে চাহি, এ সব কিছু চাহি না।" এও সেই অবস্থা। হিন্দুর বিশ্বাস এখানে আসিলে একেবারে ভগবানের সম্মুখে এসে পৌঁছা যায়, তাই এখানে কোনও ভেদবিচার

নাই। শুচি অশুচি, ব্রাহ্মণ শূদ্র, এমন কি সুরুচি কুরুচি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা হয়েছে। কারণ এ সকলের মধ্যেই ভগবানের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এখানে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কি অপরূপ লীলাই করিয়া গিয়াছেন! পুরীর সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ছুটিলেন—সঙ্গিগণ কোথায় পড়িয়া রহিল—মন্দিরের দ্বাররক্ষিগণ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, প্রেমের বন্যায় তাহারা ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গেল। মহাপ্রভু একেবারে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত! ঐ তাঁহার প্রাণনাথ; যাঁহার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আসিয়াছেন, অনন্যসহায় বৃদ্ধ মাতা, যুবতী স্ত্রী, সমাজে প্রতিষ্ঠা সকলই ছাড়িয়াছেন, সেই হৃদয়বল্লভ ঐ বেদীর উপর উপবিষ্ট। এত কাছে পাইয়াছি আর কি আলিঙ্গন না করিয়া থাকা যায়—হুঙ্কার করিয়া তিনি লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, পর-মুহূর্ত্তেই তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলেন। প্রভুর যখন চৈতন্য হইল তখন তিনি বুঝিলেন, বড় অন্যায় কাজ হইয়া গিয়াছে, এই মহা পবিত্র স্থলে এমন চপলতা প্রদর্শন করাটা উচিত হয় নাই। কি করিবেন, তিনি যে সম্বরণ করিতে পারিলেন না! তাই প্রতিজ্ঞা করিলেন,

আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥

আর নিত্যানন্দকে বলিলেন, "নিত্যানন্দ, তুমি আমাকে সংবরণ করিবে। এই দেহ তোমাকে সমর্পণ করিলাম।"

ঐ সেই গরুড়স্তম্ভ। প্রভু এই স্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন

করিতেন এবং যথাসাধ্য তাঁহার ভাবহিল্লোল দমন করিবার চেষ্টা করিতেন। তথাপি তাহার চক্ষু হইতে অজস্রধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইত এবং নিকটের গর্ত্তটি ভরিয়া যাইত।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা নাটমন্দিরে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। দুইটি বালক গান গাহিতেছিল। তাহাদিগকে ব্রজবালকের বেশে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের মধুর ও কোমল মুখ, উজ্জ্বল বেশ এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সব মিলিয়া অতি চমৎকার লাগিতেছিল। ভাগবতের দশমস্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায় হইতে বালকদ্বয় সুর করিয়া গাহিতে লাগিল। শ্লোকগুলির ছন্দ এত মধুর এবং ভাব এরূপ সরস যে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্ত্বয়ি ধৃতাসব স্ত্বাং বিচিন্বতে॥ (১)
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্ক-দাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥ (২)
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াৎ
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥ (৩)
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ (৪)
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নো শ্রীকরগ্রহম্॥ (৫)
ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ (৬)
প্রণতদেহিনাং পাপনাশনং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং॥ (৭)
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥ (৮)
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ (৯)
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং।

পারিতেছেন না, সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছেন। একটীর পর আর একটী ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কয়েক সেকণ্ডের জন্য তিনি অন্তর্হিত হইতেছেন আবার তাঁহার কৃষ্ণ মস্তক নীল তরঙ্গের গায়ে উঠিতেছে ও নামিতেছে! আমরা প্রমাদ গণিলাম। আমরা সকলে সম্পূর্ণভাবে ক্লান্ত হইয়াছিলাম। যদি তাঁহার নিকট যাইতে চেষ্টা করি তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক তাঁহারই ন্যায় বিপন্ন হইতে হইবে তখন আমাদিগকেই সাহায্য করা প্রয়োজন হইবে। আমরা একটু একটু করিয়া ঘাট হইতে প্রায় আধ মাইল তফাতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে জনমানব নাই। তথাপি আমরা প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলাম "লোক ডুবে গেল, কে আছ শীঘ্র এস"। বিজন বালুকাভূমির উপর দিয়া আমাদের চীৎকার বায়ুতে মিশাইয়া গেল। সমুদ্রের তরঙ্গগুলি বিকট আনন্দে গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমাদের মনে হইল যেন সমুদ্র এক অতি বিশালকায় নীলবর্ণের দৈত্য, আমাদের বন্ধুকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, শীকার প্রায় করায়ত্ত হইয়াছে। বলিয়া সে আরও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। এক একটী মুহূর্ত্ত এক একটী যুগের ন্যায় কাটিতে লাগিল। আমাদের চক্ষের সম্মুখে আমাদের বন্ধু ডুবিয়া যাইতেছেন, আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না, তাঁহার সাহায্য করিতে গিয়া ঐ ক্রুদ্ধ সমুদ্রে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তথাপি তাঁহার উদ্ধার করিতে পারিব না নিশ্চিত। এক একবার মনে হইতেছিল যাহাই হউক তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাই, এক্ষণে এখানে দাঁড়াইয়া থাকা মহাপাপ, কিন্তু সংসারের মায়ার বন্ধনগুলি আমাদের সদ্বিবেচনাকে জাগাইয়া দিতে লাগিল। শক্ত শুষ্ক ভূমিতে একটী পদক্ষেপ,—যে ভূমি পা'কে ঠেলিয়া রাখিবে, নির্ব্বিবাদে নামিয়া যাইতে দিবে না,—এমন একটী

পদক্ষেপের জন্য এখন কি মূল্যই না দেওয়া যায়? কোটি কোটি লোক তাহাদের পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাইতেছে, কোনও চেষ্টা করিতে হইতেছে না, কিছু যে মূল্যবান্ অধিকার পাইতেছে তাহা তাহাদের বোধ হইতেছে না, আমাদের সম্মুখে ঐ মজ্জমান বন্ধুটিকে এই অতি সহজ অতি সাধারণ অবস্থায় আনিতে কোনও মূল্যই অদেয় নহে। কিন্তু ইহা অসম্ভব।

আমার মনে হইল ইঁহার বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র পরিবার এক্ষণে কি অবস্থায় আছে। খাওয়া দাওয়া করিতেছে, গল্প করিতেছে, হয় ত দুধের বাটী পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ঠাকুরকে বকিতেছে। তাহাদের নিকটতম আত্মীয় যে সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যাইতেছে, কেহ হাত বাড়াইয়া দাও বলিয়া ব্যর্থভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে তাহা তাহারা জানে না। আর একটু পরে হয়ত টেলিগ্রাফ পিয়ন তাহাদের দরজায় ধাক্কা দিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়া আসিবে, তখন সেখানে কি ভয়ানক শোকাবহ দৃশ্যের অভিনয় হইবে।

আমরা প্রাণপণে চীৎকার করিতেছিলাম। হায় এখনও যদি কেউ আসে—।

না—আর বুঝি হইল না। বুঝি বহুদিন হইতেই নিয়তি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন আমাদের বন্ধু এখানে এই ভাবে প্রাণ হারাইবেন।

এমন সময় বালুকাময় তীরের উপর একটি কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল। সে একজন ধীবর আমাদের চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। আমরা আরও জোরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

কটিদেশে স্বল্পমাত্র বস্ত্রখণ্ড, মাথায় তালপাতার টুপি লোকটা তীরবেগে ছুটিয়া আসিল। সমুদ্রের জল পায়ে ছুঁইবার আগে একবার প্রণাম করিল, তাহার পর অবলীলাক্রমে ঢেউ কাটাইয়া আমাদের বন্ধু

অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। লোকে সোলার পুতুল যেমন সহজে তোলে, লোকটা তেমনি করিয়া আমাদের বন্ধুকে তুলিয়া আনিল।

জয় জগন্নাথ দেবের জয়! আমাদের বন্ধু বাঁচিয়া গেলেন।

সকলে ধরিয়া তাঁহাকে তীরের উপর শুষ্ক স্থানে আনিয়া রাখিলাম। অবসন্ন শরীরে তিনি এলাইয়া পড়িলেন।

সেই হইতে সমুদ্রকে দেখিলেই মনে কিরূপ বিজাতীয় ভাবের উদয় হয়। উর্ম্মিমালার সে সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাই না। তীরের নিকট চূর্ণ হইয়া ঢেউয়ের স্বল্প সলিল যখন দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসে, মনে হয় ঐ বিকটাকার দৈত্যের লোলুপ হস্ত বুঝি ব্যর্থ লালসায় প্রসারিত হইতেছে।

আজ এই খানেই শেষ করিলাম।

আর তিন দিন পরেই তোমাদের সহিত দেখা হইবে। ইতি

তোমার অভিন্নহৃদয়

সুনীতি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতীক্ষা

প্রভাত কাল। নিদ্রোত্থিত বিশালকায় প্রাণীর ন্যায় কলিকাতা নগরীর সকল অঙ্গ নড়িয়া উঠিয়াছে। রাজপথ দিয়া অবিরাম জনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া ট্রাম গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। "এইও যানেবালা হট যাও" প্রভৃতি চীৎকারের

দ্বারা পদাতিক জনসমূহের প্রতি মহতী অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বড় লোকের গাড়ীর সহিস কোচম্যান ঢং ঢং ঘণ্টা বাজাইয়া রবার টায়ার গাড়ীগুলি হাঁকাইয়া চলিতেছে। যাঁহারা আরও বড় লোক তাঁহাদের মোটরকার গুলি নানা প্রকার বিসদৃশ ধ্বনিতে রাজপথগামী লোকের হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়া সম্মুখে সুদর্শন চক্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিদ্যুৎ-বেগে ধাবিত হইতেছে। ফেরিওয়ালার দুর্ব্বোধ্য চীৎকারে তাহাদের পণ্য দ্রব্য বিজ্ঞাপিত করিয়া রাস্তায় ও গলিতে ঘুরিতেছে। পথের ধারে রকের উপর খালি গায়ে বসিয়া কলিকাতার বাবুরা চায়ের সহযোগে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন এবং ঘোড়দৌড়, নূতন থিয়েটার প্রভৃতি সর্ব্ব-সাধারণের চিত্তাকর্ষক বিষয় সাগ্রহে আলোচনা করিতেছেন। নানা প্রকারের কোলাহল মিশ্রিত হইয়া আকাশে উত্থিত হইতেছে।

বাড়ীর দোতালার উপর জানালার গরাদে ধরিয়া মৃন্ময়ী বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু প্রভাতসূর্য্যের কনকরশ্মি আলোকিত এই দৃশ্যের কিম্বা নগরের বিচিত্র কলরবের প্রতি তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইল না। কোথায় দূরে দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বু-রাশি, আকাশের গায়ে ঘনশ্যাম শৈলশিখরমালা, কোথায় গগনস্পর্দ্ধী মন্দিরচূড়া, মৃন্ময়ীর কল্পনার চক্ষে এই সকল সুন্দর দৃশ্য ভাসিয়া উঠিতেছিল, এবং এই সকল দৃশ্যের মধ্যে একটী দীর্ঘায়ত সুন্দর যুবা পুরুষের প্রফুল্ল মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়া ইহাদিগকে সুন্দরতর করিয়া তুলিতেছিল। সে নিজে সুনীতির নিকট হইতে কোন পত্র পায় নাই বটে, কিন্তু তাহার মায়ের নামে, খোকার নামে, কখনও বা তাহার পিতার নামে দুই চারি দিন ছাড়া নিয়মিত ভাবে পত্র আসিত। তাহাতে সুনীতি যে সকল স্থান দেখিত, তাহার বর্ণনা থাকিত।

মৃন্ময়ী বসিয়া আছে এমন সময় ডাকপিয়ন ডাকিল, "বাবু-চিঠ্‌ঠি"।

মৃন্ময়ী নীচে চাহিয়া দেখিল পিয়ন জানালার মধ্য দিয়া চিঠি ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মৃন্ময়ীর মনে হইল বুঝি সুনীতির চিঠি। খোকা এখনও বেড়াইয়া ফেরে নাই। নীচে কেহ নাই। মৃন্ময়ী নীচের ঘরে নামিয়া গেল। সুনীতির চিঠিই বটে। সেই পরিচিত মুক্তাবলির ন্যায় অক্ষরে খোকার নাম লেখা। এ চিঠি তাহার ত খুলিয়া পড়া হইতেই পারে না। খোকা আসিয়া পড়িবে। চিঠিখানি হাতে করিয়া মৃন্ময়ী ভাবিতেছিল চিঠিখানি উপরে লইয়া যাইবে না এখানেই রাখিয়া যাইবে। রাখিয়া গেলে যদি কোনও গতিকে হারাইয়া যায়? আর নিজে উপরে লইয়া যাইতে বড় লজ্জা করে,—ছিঃ। এইরূপ দোলাচলচিত্তবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে খোকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। খোকা বেড়াইয়া ফিরিয়াছে। তাড়াতাড়ি পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মৃন্ময়ী অর্গল মোচন করিল। খোকা ভিতরে আসিলে তাহাকে বলিল, "খোকা ঐ তোর চিঠি এসেছে"। "এ যে মাষ্টার মশায়ের চিঠি" বলিয়া খোকা চিঠি লইয়া ভিতরে ছুটিয়া গেল এবং তাহার মাকে ধরিয়া আনিয়া দোতালার বারাণ্ডায় বসিয়া তাঁহাকে চিঠি শুনাইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "মিনু কোথায় গেলি মা?" মৃন্ময়ী পাশের ঘরেই ছিল। কিন্তু সে যেন কিছুই জানে না এই ভাবে বারাণ্ডায় আসিয়া বলিল, "কি বলছ মা?" অন্নপূর্ণা বলিলেন, "খোকা সুনীতির চিঠি পড়্ছে। বসে শোন্।" এ বিষয়ে সে যেন একান্ত উদাসীনা এই ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া সে অল্প দূরে জানালার ধারে বসিয়া পত্র শুনিতে লাগিল।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে পত্র আসিয়াছে। দ্বীপখচিত নীল সমুদ্র, সমুদ্রের উপর রেলওয়ে সেতু, ডুবুরিদের ছোট ছোট নৌকা, রামেশ্বরের বৃহৎ মন্দির, সমুদ্রবেষ্টিত ধনুষ্কোটির সঙ্কীর্ণ তটভূমি, সিংহলযাত্রী জাহাজ

প্রভৃতির বর্ণনা ছিল। চিঠি পড়া হইয়া গেলে সকলে আপন আপন কর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। খোকা অনেকক্ষণ স্কুল চলিয়া গিয়াছে। বিন্দুমাধববাবু আফিস গিয়াছেন। অন্নপূর্ণা আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। বাড়ী নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া মৃন্ময়ী খোকার পড়িবার ঘরে গেল। টেবিলের উপর সুনীতির চিঠি পড়িয়াছিল। মৃন্ময়ী সলজ্জচিত্তে চারিদিকে চাহিয়া চোরের মত চিঠিখানি লইয়া আসিল। তাহার পর একটী নির্জ্জন ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া বসিল। খামের উপরের ঠিকানা হইতে আরম্ভ করিয়া পত্রের শেষ পর্য্যন্ত একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিল। যেখানে বেশী ভাল লাগিল সেখানে প্রত্যেক বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িল। তাহার ইচ্ছা পত্রের সমগ্র সৌন্দর্য্য নিঃশেষ ভাবে গ্রহণ করে। এই ভাবে পত্রখানি যখন প্রায় মুখস্থ হইল তখন সেটি সযত্নে খামের মধ্যে রাখিয়া আর একবার চারিদিকে চাহিয়া পত্রখানি হৃদয়ে ধারণ করিল। এই সময় হঠাৎ পিছনে খস্ করিয়া শব্দ হইল। মৃন্ময়ীর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বুঝি তাহার এই অসমসাহসিক কার্য্য কাহার নিকট ধরা পড়িয়াছে! তাড়াতাড়ি পত্রখানি সরাইয়া লইয়া সভয়ে ফিরিয়া চাহিল। যাক্, ও কিছু নয়, বিড়ালটা লাফাইয়া পড়িয়াছিল। অকারণে ভয় পাইয়াছিল বলিয়া মৃন্ময়ীর শুষ্ক ওষ্ঠে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বিড়ালটা সন্দিগ্ধভাবে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল। মৃন্ময়ী পুনরায় অমৃতের ন্যায় হৃদয়-শীতল-কারী সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তাহার পর পুনরায় অতি সন্তর্পণে খোকার ঘরে গিয়া চিঠিখানি যে ভাবে ছিল, ঠিক সেই ভাবে রাখিল। তাহার

ভয় করিতেছিল খোকা হয়ত টের পাইতে পারে যে তাহার ন্যায় অনধিকারী ব্যক্তি উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

সুনীতি দূরদেশে যাইবার পর হইতে এই ভাবে মৃন্ময়ীর দিন কাটিতেছে। ঘরকন্নার যে সকল কাজ সে আগে পূর্ণ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিত, আজ কাল সে সব কর্ত্তব্যের খাতিরে চেষ্টা করিয়া করিতে হয়। পুতুলগুলো অযত্নে পড়িয়া আছে, ফুলগাছগুলিতে আর নিয়মিত জল দেওয়া হয় নাই—ফুলের কুঁড়ি হইয়া শুকাইয়া পড়ে, তাহার আদরের টিয়াপাখিটিও সময় মত আহার না পাইয়া ক্ষুধায় চীৎকার করে, তাহাকে কেহ আর এখন আদর করিয়া বুলি শিখায় না। সংসারের সকল ব্যাপার তাহার নিকট অনর্থক মনে হয়, কোন প্রসঙ্গে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। শুধু যখন কোনও উপলক্ষে সুনীতির কথা উঠে, তখন তাহার সমস্ত হৃদয় উৎসুক হইয়া উঠে। মরুভূমির মধ্যে নির্ঝরিণীর সন্ধান পাইলে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেরূপ আগ্রহে ধাবিত হয়, সেইরূপ আগ্রহে মৃন্ময়ীর মন তৎপ্রতি প্রবাহিত হয়। কেহ সুনীতির কোনও গুণের প্রশংসা করিলে তাহার চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠে। কিন্তু সুনীতির কথা শুনিয়াও যে তাহার তৃপ্ত হইবার উপায় নাই। লজ্জায় তাহার কর্ণমূল লাল হইয়া উঠে। তাহাকে সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইতে হয়।

সুনীতি লিখিয়াছিল যে সে আর প্রায় পনের দিন পরে ফিরিয়া আসিবে। এই সুদীর্ঘ পনের দিন কি করিয়া কাটাইবে তাহা ভাবিয়াই মৃন্ময়ী অস্থির হইয়াছিল। তাহার দিন কি কাটিতে চায়? রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলেই ত চট করিয়া সকাল হইয়া যায়। কিন্তু দিনের বেলাই মুস্কিল। বেলা আর বাড়ে না,—গাছের ছায়াও আর নড়ে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।

সুনীতি দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়াছে। আজ সে বিন্দুমাধববাবুর বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন,—বিন্দুমাধববাবু, অন্নপূর্ণা, খোকা এমন কি বাড়ীর দাসদাসী পর্য্যন্ত। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ হইয়াছিল যাহার, তাহার পক্ষে সে আনন্দ বাক্যে বা ভাবে প্রকাশ করা একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করা সম্ভব নয়। তাই যাহারা বুঝিবার তাহারা বুঝিল—মৃন্ময়ীর এক্ষণে মনের ভাব কি প্রকার।

অনেক রাত্রে বিন্দুমাধববাবু ও অন্নপূর্ণার এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "মেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠল, আর ত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না।"

বিন্দুমাধববাবু বলিলেন, "আমি ঘটককে একটি ভাল পাত্রের সন্ধান লইতে বলিয়াছি। কিন্তু সব দিকে মনোমত পাত্রটি চট্‌ করে পাওয়া বড় কঠিন। মেয়ের যেমন ভাগ্য তেমন হবে।"

অন্ন। ঘটক আস্‌বার আগেই যে ব্যাপার অনেকখানি এগিয়েছে।

বিন্দু। তুমি কি বিপিনের কথা বল্‌ছ? তা বিপিন ছেলেটি বেশ ভাল বলেই বোধ হয়। আর সুনীতির সঙ্গে খুব ভাব। সুনীতি যদি

বলে তা হ'লে নিশ্চয়ই রাজি হবে। তা হ'লে বিপিনের মায়ের কাছে একবার ঘটকী পাঠাতে হয়।

অন্ন। হ্যাঁ বিপিন খুব ভাল ছেলে বটে, কিন্তু বিপিনের কথা আমি বলছি না।

বিন্দু। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্তে পার্‌ছি না।

অন্ন। পুরুষমানুষ এমনি অন্ধই বটে। তুমি তা হ'লে কিছুই দেখ্তে পাও না? মেয়েটা আজকাল কি রকম নিরানন্দে থাকৃত, আর আজ তার মুখ চোখ দিয়ে কেমন আনন্দ ঝরে পড়্‌ছিল—তুমি সে সব কিছুই দেখ নাই? মিনু দিনরাত সুনীতির কথা ভাবে, আর—যদি পুরুষ মানুষের মনের ভাব বোঝ্‌বার আমার কিছু ক্ষমতা জন্মেছে—তা হ'লে সুনীতির এই ভাবনাটা খুব সামান্য বলে মনে হয় না।"

বিন্দু। সুনীতির মত পাত্র দেশে দুটি আছে কি নাই। কিন্তু তা কি করে হবে?

অন্ন। হবে না কেন?

বিন্দু। তোমাকে বলিয়াছি সুনীতি বি-এ পরীক্ষায় কেমন ভাল পাশ করেছে।

অন্ন। তা ত শুনিয়াছি। কিন্তু সে জন্য যে আমাদের মিনুর সহিত তাহার বিয়ে হতে পারে না তা বুঝিতে পারি নাই।

বিন্দু। এত ভাল পাশ করিয়াছে, তাহার মামা এত বড়লোক, তিনি কেন তোমাদের ঘরে তাঁর ছেলের বিবাহ দেবেন। কত রাজা তাদের মেয়ে নিয়ে তাঁর খোসামোদ কর্ব্বে। কৃষ্ণমোহনবাবু সুনীতিকে তাঁর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। তাঁর বিষয়ের মূল্য কয়-লাখ টাকা খবর রাখ?

অন্ন। না সে খবর রাখি না। তবে এ খবর রাখি যে, যে মেয়েটি

পুরুষমানুষের মনে ধরে পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি সে মেয়েমানুষের পায়ের তলায় পড়ে থাকে।

অতঃপর যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া অন্নপূর্ণা তাঁহার স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন, সে সকল সবিস্তারে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, ইহা বলিলেই চলিবে যে সেই সকল প্রবল যুক্তির প্রভাবে বিন্দুমাধববাবু স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে সুনীতির সহিত মৃন্ময়ীর বিবাহ হইলে তাহারা উভয়েই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইবে, এবং আপাততঃ বিন্দুমাধববাবুর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে রজনী প্রভাত হইলে তাঁহার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কৃষ্ণমোহন-বাবুর নিকট এই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। বিন্দুমাধববাবু একবার এ কথা তুলিয়াছিলেন যে এরূপ প্রস্তাব করিলে কৃষ্ণমোহনবাবু ভাবিতে পারেন যে ইঁহারা অসময়ে সুনীতির উপকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা হইতে অন্যায় ভাবে সুবিধা করিয়া লইতেছেন। কিন্তু অন্নপূর্ণা স্বামীকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে এ বিবাহে সুনীতি সম্পূর্ণভাবে সুখী হইবে। সুতরাং বিন্দুমাধববাবুর আপত্তি আর টিকিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উৎসব রজনী।

বিপিনের দৈনিক জীবন-কাহিনীর কয়েকটি পৃষ্ঠা।

"মৃন্ময়ীর সহিত সুনীতির বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহে সকলেই সুখী। মৃন্ময়ীর পিতামাতা সুখী। সুনীতির মামা সুখী। আত্মীয়-স্বজন সুখী,—কারণ তাহারা এ কয়দিন ধরিয়া বিবাহ-বাড়ীতে আহার ও আমোদে ব্যাপৃত ছিল। বন্ধুবান্ধব সুখী, তাহারা বলিতেছে—

সমানয়ং স্তুল্যগুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

পাড়া প্রতিবেশী, দাসদাসী, সকলেই সুখী হইয়াছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যেন সুখের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। সেই বন্যায় গা ঢালিয়া দিয়া দুইটী প্রাণী পরস্পরের সঙ্গসুখে বিভোর হইয়া চলিয়াছে। মৃন্ময়ী ও সুনীতি, সুনীতি ও মৃন্ময়ী—ইহারা আজ এক,—অভিন্ন গোত্র ও অভিন্ন হৃদয়। এই জগতে অহর্নিশ যে দ্বন্দ্ব ও স্বার্থান্বেষণের সংঘাত চলিয়াছে তাহার মধ্যে এই দুইটি প্রাণী প্রেম ও পরার্থপরতার সন্ধান পাইয়াছে। আজ ইহাদের চক্ষে জগৎ শরৎকালের প্রভাতকালীন কুসুম উদ্যানের ন্যায় মনোহর এবং জীবনযাত্রা এক পুষ্পবিরচিত পন্থার ন্যায় চিত্তাকর্ষক।

"আজিকার এই সুখের প্রবাহে তুমিও কেন তোমার হৃদয় ভাসাইয়া দাও না? এই সর্ব্বসাধারণ আনন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে তোমার হৃদয় কেন বেসুরো বাজিতেছে? তুমি সুনীতির বন্ধু, মৃন্ময়ীর শুভাকাঙ্ক্ষী।

তাহাদের সুখ আজ পরিপূর্ণ হইয়াছে। সকলের হৃদয় সেই জন্য প্রফুল্ল, কেবল তোমারই হৃদয় কেন বিষাদভারাক্রান্ত? সকলে মিলিয়া যেখানে আনন্দ করিতেছে তুমি কেন সে স্থান হইতে নির্জ্জনে সরিয়া আসিয়া রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তোমার হৃদয়ের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছ? ঐ সানাই বাজিতেছে—পথিকের হৃদয়ও ঐ ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছে। কিন্তু উহার মাধুর্য্য তোমার নিকট কেন নিষ্ফল হইয়াছে?

"কেন হইয়াছে তাহা আমার বলিবার ইচ্ছা নাই। আমার হৃদয়ের কথা আমি কেন পরকে বলিতে যাইব? এ সংসারে কয়টা লোক পরের কথা ভাবে? কয়টা লোক পরের দুঃখে মনে মনেও সহানুভূতি করে। নিজের কথা লইয়াই সকলে ব্যস্ত। নিজের সুখ হইলেই হইল। নহিলে দেখিতেছ না ঐ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা—তাহার মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, মূল্যবান্ দর্পণ ও গৃহসজ্জা, এবং ঐ প্রাসাদের বাহিরেই পথের ধারে দীন দরিদ্র, অন্ধ খঞ্জ, খাইতে পায় না পড়িয়া থাকে। দেখ সংসারে কত দুঃখ কত শোক, তথাপি সংসারের লোক নিজের সুখ ও বিলাস লইয়াই ব্যস্ত। নিজের সুবিধার জন্য মানুষ লক্ষ লক্ষ মূকপ্রাণীকে কত কষ্ট দিতেছে। এই হৃদয়হীন সংসারে আমি কাহাকেও নিজের দুঃখের কথা বলিতে চাহি না।

"তবে হে আমার প্রিয় সঙ্গী জীবন-কাহিনী, তোমার নিকট আমি সে কথা বলিব। তোমার নিকট আমি কিছুই গোপন করি নাই, ইহাও গোপন করিব না। আমার হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বলি এমন বন্ধু সুনীতি ছাড়া আমার কেহ নাই। কিন্তু এ কথা ত সুনীতিকেও বলিতে পারিব না। হে জীবন-কাহিনী আমার হৃদয়ের দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি। তোমার নিকট হৃদয়ের অন্তঃস্থ কথা বলিতে আমার ভাল লাগে। দুঃখের কথা বলিলে আমার দুঃখের লাঘব

হয়, আমি জানি যে অসময়ে তুমি আমার দুঃখের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিবে না। আমার পুরাণ সুখ দুঃখের কথা যখন ভুলিয়া যাই, সংসারের নিত্য নূতন আঘাতে তাহাদের স্মৃতি যখন মলিন হইয়া যায়, তখন আমি তোমার নিকট আসি তুমি আমাকে সেই সকল প্রিয় ও পুরাতন কথা শোনাও। তোমার সাহায্যে সেগুলি আমি নূতন করিয়া অনুভব করি। হে আমার সঙ্গিহীন জীবনের একমাত্র সাথী, আজ যে দুঃখে আমার হৃদয় লুটাইয়া পড়িতেছে তাহা আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। নির্দ্দয় সংসারের নিকট হইতে তুমি তাহা গোপন করিয়া রাখিবে।

"মৃন্ময়ী আমাদের পাড়ার মেয়ে। ছেলেবেলা হইতে আমি তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি। তাহাকে দেখিতে আমার ভাল লাগিত। তাহার বালিকাসুলভ চপলতা, তাহার মধুর অঙ্গবিক্ষেপ ও সুমধুর কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করিত। আমার ছোট বোনের সঙ্গে সে খেলিতে আসিত, খেলিতে খেলিতে কখনও ঝগড়া করিত, কখনও আবার সাধিয়া ভাব করিত। কখনও আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মধ্যস্থ করিত। তাহাদের বাড়ীতে বসিয়া যখন সুনীতির সঙ্গে গল্প করিতাম কতবার সে সুনীতিকে তুচ্ছ কথা শুনাইবার জন্য ছুটিয়া আসিত, আবার হঠাৎ চলিয়া যাইত। তখন বুঝিতে পারি নাই যে আমার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর নিহিত হইয়াছে। ক্রমে আমি দেখিলাম যে সুনীতি ও মৃন্ময়ীর হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তখন আমার আর ফিরিবার পথ ছিল না। আমার হৃদয়ে প্রথমে যাহা অঙ্কুর ছিল, তাহা তখন শাখা পল্লব পুষ্পে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার মূল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আমার হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

"সেই হইতে আমি দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। তাহাদের বাড়ী আর যাইতাম না। কিন্তু আমার হৃদয় হইতে তাহার চিন্তা সরাইতে

পারিলাম না। কলেজে পড়া শুনিতে শুনিতে বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িলে দেখিতাম নীল আকাশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত, দুই চারিটি শুভ্র মেঘখণ্ড অতি ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে, কতকগুলি চিল বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে, কখনও কখনও এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের শুভ্র দেহগুলি সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, নারিকেল বৃক্ষের শাখাগুলি মন্দ পবনে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে ও তাহাদের বিরামহীন সঙ্গীত গাহিয়া যাইতেছে। নীচে রৌদ্রোজ্জ্বল অনন্ত গৃহশ্রেণী। এই অলস মধ্যাহ্নের ছবি দেখিতে দেখিতে আমি অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িতাম। আমার হৃদয় তাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইত। সে এখন কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে তাহাই মনে হইত। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চেতনা হইত, দেখিতাম পড়া আগাইয়া গিয়াছে। আমি আমার বিক্ষিপ্ত মন কুড়াইয়া আনিয়া পাঠ্যপুস্তকে নিবিষ্ট করিতাম।

"সে দিন সুনীতি আসিয়া আমাকে বলিল যে তাহাদের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আমি সে সংবাদ শুনিয়া যথাবিহিত আনন্দ প্রকাশ করিলাম। আমার বন্ধু জানিতে পারিল না,—আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কি আবেগ বাহির হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিল না তাহাদের আনন্দের নীচে আমার জীবনের সকল সুখকুসুম ও আশার অঙ্কুর নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে। এ কথা তাহারা যেন কখনও না জানিতে পারে। আমার মনের কষ্ট শুনিয়া তাহাদের সুখের মাত্রা যেন বিন্দুমাত্রও কমিয়া না যায়। তাহারা সুখে থাকুক।

"যে দিন মৃন্ময়ীর বিবাহ হইল সে দিন বহু বিরোধী ভাবের সংঘাতে আমার হৃদয় পর্য্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত হইতে বিবাহের আয়োজন চলিতেছিল। সানাইয়ের সুমধুর ধ্বনি আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতেছিল। আমার

হৃদয়ের নিভৃতপ্রান্তে বসিয়া ছলনাময়ী আশা বলিতেছিল—এখনও এ বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন মনকে জিজ্ঞাসা করিতাম—তুমি কি চাও যে এ বিবাহে বিঘ্ন উপস্থিত হউক—তখন মন প্রবল ভাবে বলিত—না, না, তাহা যেন না হয়। পরমুহূর্ত্তেই আবার আশার ছলনায় ভুলিত। মন এমনই মূঢ়।

"সন্ধ্যাগমে সুনীতিদের বাটীর ধারে শ্রেণীবদ্ধ উজ্জ্বল আলোক সজ্জিত হইল। সুন্দর বেশ পরিয়া, গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া, প্রফুল্লমুখে বন্ধুগণ সমবেত হইল। তাহাদের উচ্চকণ্ঠের হাস্যধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রবল বাদ্যধ্বনিতে আকাশবায়ু এবং আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল, বাদকগণ বাদ্যের গায়ে যে আঘাত করিতেছিল প্রত্যেক আঘাতটি আমার হৃদয়ের ঠিক অন্তঃস্থলে অবতীর্ণ হইতেছিল। সে আঘাতে যেন আমার হৃদয়ের সকল সুখ আশা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুন্দর বেশে [illegible] হইয়া গলায় ফুলের মালা দোলাইয়া সুনীতি আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। তাহার স্বভাবসুন্দর মুখ চন্দনচর্চ্চিত হইয়া যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার আকৃতি প্রসন্ন ও গম্ভীর—যেন একটা সুখের সমুদ্র তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রশান্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে বাদ্যের শব্দ ডুবিয়া গেল। সুনীতির মাথার উপর অজস্র পুষ্প ও লাজ বর্ষণ হইল। আমরা যাত্রা করিলাম।

"আমি সে বিবাহ রাত্রির বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না। সুন্দর ও উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি একটির পর একটি আবির্ভূত হইতে লাগিল। সুনীতির হাতের উপর মৃন্ময়ী তাহার ক্ষুদ্র ও কোমল হাতখানি রাখিয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মোদ্গম হইয়াছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছিল এবং গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। সুনীতি মন্ত্র পড়িয়া মৃন্ময়ীর হৃদয় এবং অঙ্গ

প্রত্যঙ্গগুলি একে একে আপনার করিয়া লইল। বর্ষার প্রবল উচ্ছ্বাসে পদ্মার কূল যেমন বারবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, আমার হৃদয়ের মধ্যে সেইরূপ হইতেছিল। বরবধূ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। আমি বিবাহ-সভা হইতে চলিয়া আসিলাম।

"সে রাত্রে ঘরের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না। চারিধারে আগুনের বেড়া দিয়া ঘেরা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাস্তায় বাহির হইলাম। দ্রুতপদে একটীর পর একটী করিয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিতে লাগিলাম। অবশেষে শেষ রাত্রে গড়ের মাঠে এক বৃক্ষ-তলে শ্রান্ত দেহে বসিয়া পড়িলাম। স্থানে স্থানে দুই একটি নিরাশ্রয় হতভাগ্য লোক পড়িয়াছিল। কিন্তু আমার ন্যায় নিরাশ্রয় বোধ হয় কেহই ছিল না।

"রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। আমি বসিয়া বসিয়া লিখিতেছি। আর তাহারা? তাহারা এক্ষণে নির্জ্জন গৃহে পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেছে। হয় ত একজন বলিতেছে যে তাহার বড় ভয় হইত পাছে তাহাদের মিলন না হয়,—কত সম্ভব ও অসম্ভব আশঙ্কায় হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, যে আশঙ্কাগুলি আজিকার শুভমিলনে অপূর্ণ হইয়া সার্থক হইয়াছে। নিস্তব্ধ রজনী এবং বিনিদ্র তারকাবলি তাহাদের এ আনন্দের সাক্ষী। ঈশ্বর করুন এমন সুখেই যেন তাহাদের দিন কাটিয়া যায়।

"মৃন্ময়ী আজ আর একজনের হইল। এখন কি তাহার কথা ভাবা আমার অন্যায় হইবে? আমার চিন্তার মধ্যে যদি লেশমাত্র পাপস্পর্শ না থাকে তাহা হইলে কেন অন্যায় হইবে? কখনও তাহাকে নিজের বলিয়া পাইব এ আশায় ত আমি তাহার কথা ভাবিব না। তাহার চিন্তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ, অথচ ইহাতে কাহারও সুখের হানি নাই; তাই তাহার কথা ভাবিব। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ইহাতে

কোনও অন্যায় নাই। ভগবান্ মানুষকে যে সকল দান করিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান এই যে একজন মানুষ কি ভাবিতেছে আর কেহ তাহা জানিতে পারিবে না। আমি মৃন্ময়ীর কথা ভাবিব, সংসারে কেহ তাহা জানিতে পারিবে না। মৃন্ময়ীর গোপনীয়তম মুহূর্ত্তগুলি আমার কল্পনা চক্ষুর অগোচর থাকিবে না।

"ব্যর্থ—ব্যর্থ, আমার জীবনের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। জীবনের মধ্য হইতে, জগৎ হইতে কত দুঃখ আহরণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম ইহাদিগকে তোমার নেত্রপ্রান্তবিলম্বী অশ্রুবিন্দুতে পরিণত করিয়া দিব। সন্ধ্যাগগন হইতে কারুণ্যপ্রবাহে তোমার হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিব। নিস্তব্ধ নিশীথের বর্ষণ ধ্বনিতে তোমার হৃদয় শান্ত করিয়া দিব। যখন যাহা কিছু সুন্দর বা করুণ দেখিতাম, তোমার কথা মনে হইত, ভাবিতাম তুমি কাছে নাই বলিয়া ইহাদের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কবে তুমি আমার জীবন উৎসবময় করিয়া উদিত হইবে, আমি তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। আমার সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল।

"আজ হইতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সমৃদ্ধির মধ্যে একটা অভাব, আমার সকল সফলতার মধ্যে একটা ব্যর্থতা, সকল আনন্দের মধ্যে একটা অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
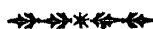
গৃহস্থালী।

সুনীতির বিবাহের পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এ দুই মাস যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা সুনীতি বা মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিতে পারিবে না। এ দুই মাস তাহারা যেন এ পৃথিবীতেই বাস করে নাই। যেন কোন কল্পনার লোকে, কোন বাসনার রাজ্যে, তাঁহারা বাস করিতেছিল। সেখানে শুধু সঙ্গীত, প্রেম ও অনাবিল আনন্দ। তাহাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, জগতের প্রতি তুচ্ছ ঘটনা যেন পরিপূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের হৃদয়ের প্রেম হৃদয় ছাপাইয়া সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। সুনীতির মুখশ্রী আরও প্রফুল্ল আরও গম্ভীর হইয়াছে। মৃন্ময়ীর প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে—আঁখির কোণ হইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত।

ভোর বেলায় উঠিয়া মৃন্ময়ী বাড়ীর কাজ কর্ম্ম করিতেছিল। মৃন্ময়ী যদিও এখনও নববধূ তথাপি তাহাদের গৃহে অপর কোনও স্ত্রীলোক না থাকায় সে বাড়ীর সকল কাজের ভার শীঘ্র শীঘ্র আপনার উপর তুলিয়া লইয়াছে। সে নিজে স্নান করিয়া সুনীতির মুখ ধুইবার জল গামছা ধৌত বস্ত্র প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিল। তাহার পর পূজার ঘর স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া সুনীতি আহ্নিক করিবে বলিয়া আসন পাতিয়া রাখিল এবং আসনের সম্মুখে কোশাকুশি গঙ্গাজল প্রভৃতি রাখিল। তাহার পর

সাজি লইয়া গৃহসংলগ্ন উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া শিবপূজা করিতে বসিল।

একটু বেলাতে সুনীতির ঘুম ভাঙ্গিল। সে হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া যখন পূজাঘরে গেল তখনও মৃন্ময়ীর পূজা শেষ হয় নাই। মৃন্ময়ীর পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, অসংযত স্নিগ্ধ কেশরাশি পৃষ্ঠে এলাইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত, মুখমণ্ডল পবিত্রভাবচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। সুনীতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা মৃন্ময়ী টের পাইল না, সে পুষ্প ও বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাগঠিত শিবলিঙ্গের উপর অর্পণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়া সুনীতি স্বয়ং পূজা ও আহ্নিক করিতে বসিয়া গেল।

শিবপূজা সমাপ্ত হইলে মৃন্ময়ী সুনীতির জন্য খাবার রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইল। সুনীতি খাবার খাইয়া বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিল।

বৈঠকখানা ঘরে নারায়ণ বসিয়াছিল। নারায়ণকে পাঠক চিনিতে পারিতেছেন কি? যে বালকটি পয়সা হারাইয়া পথে বসিয়া কাঁদিতেছিল এ সেই বালক। সুনীতিকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুনীতি তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা কেমন আছেন নারায়ণ?"

নারায়ণ বলিল, "বাবার চোখের কষ্ট কম আছে। কাল রাত্রে বেশ ঘুমাইয়াছিলেন।"

সু। তোমার বোনের কোনও যায়গায় সম্বন্ধ স্থির হইল?

না। বর্দ্ধমান জেলায় একটী পাত্রের সন্ধান পাইয়াছি। তাহাদের চাষ বাস আছে। অবস্থা মধ্যবিত্ত রকমের।

সু। ছেলেটি কি করে?

না। বর্দ্ধমান কলেজ থেকে এফ এ পাশ করিয়াছিল। আর পড়ে নাই। চাকরিরও চেষ্টা দেখে নাই। চাষবাস দেখিবে ঠিক করিয়াছে। কারণ বড় ভাই বিদেশে চাকরি করে। তাহারা দুই ভাই মাত্র।

সু। স্বভাব চরিত্র কি রকম কিছু খবর পাইয়াছ?

না। আমার মামাত ভাই তার সঙ্গে পড়িত তার বিশেষ বন্ধু। সে বলিয়াছে যে ছেলেটির স্বভাব চরিত্র খুব ভাল। আর ইংরাজী পড়িয়াও আচার ব্যবহার কিছু মাত্র নষ্ট হয় নাই। বাবা বলেন 'দেখিস্ যাদের ফিরিঙ্গিদের মত চাল চলন তাদের বাড়ীতে মেয়েটাকে দিস্ নি। গরীবের ঘরে না খেতে পায় সেও ভাল।' মোটের উপর পাত্রটি খুবই ভাল। আমাদের অবস্থার লোকের নিকট মেয়ে নিবে এমন আশা করা যায় না। তবে আমার মামাত ভাই বল্‌লে তারা একটী সুন্দরী মেয়ে খুঁজচে। টাকা কড়ি বড়মানুষি ঘর কিছুই চায় না। তাই যা আশা।

সু। তুমি যা বল্‌লে তাতে পাত্রটি খুব ভাল বলেই বোধ হয়। তবুও একবার দেখে আস্‌া দরকার। কোন্ ষ্টেশনে নাম্‌তে হয়?

না। মানকর ষ্টেশন থেকে ছ'ক্রোশ।

সু। চল তবে একদিন দেখে আসা যাক্।

না। আপনিও যাবেন?

সু। বেশ ত নূতন যায়গা দেখা হবে।

কোন্ দিন যাওয়া হইবে তাহা স্থির করিয়া নারায়ণের মামাত ভাইকে পত্র লিখিয়া সংবাদ দেওয়া হইল। অতঃপর নারায়ণ উঠিয়া গেল। সুনীতি পড়িবার ঘরে গেল।

লেখা পড়ায় সুনীতির বিশেষ আগ্রহ ছিল বলিয়া কৃষ্ণমোহনবাবু গৃহের সর্ব্বোচ্চতালায় নির্জ্জন স্থানে সুনীতির জন্য পড়িবার ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহটি মর্ম্মর মণ্ডিত। চারিদিকে সুন্দর বহুমূল্য আলমারির

মধ্যে পুস্তকগুলি সজ্জিত থাকিত। বহুক্লেশ ও অর্থব্যয় করিয়া এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুস্তকের সংগ্রহ করা হইয়াছিল। দক্ষিণদিকের জানালার ধারে দুই তিনটি সোফা। একটী সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের টেবিলের উপর রজতনির্ম্মিত মস্যাধার ও সুবর্ণখচিত লেখনী সজ্জিত ছিল।

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া সুনীতি নীচে গিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিল। তৎপরে মধ্যাহ্ন আহারে উপবিষ্ট হইল।

মৃন্ময়ী থালায় করিয়া ভাত ও নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজাইয়া আনিল। সমস্তই সে স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিল। তাহাদের দুই জনের এবং যখন কৃষ্ণমোহন বাবু বাড়ীতে থাকেন—(তিনি প্রায়ই বিদেশে থাকিতেন) তাঁহার খাবার মৃন্ময়ী নিজে রাঁধিত। বামুন ঠাকুর বাড়ীর চাকর বাকরদের জন্য রান্না করিত। মৃন্ময়ী নিকটে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। সুনীতি আহারাদি শেষ করিয়া উপরের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল।

মৃন্ময়ীও শীঘ্র নিজের আহার শেষ করিয়া দাস দাসীরা খাইতে বসিয়াছে দেখিয়া উপরের ঘরে সুনীতির নিকট গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও গল্পের পর সুনীতি মৃন্ময়ীকে কিছু সংস্কৃত ও ইংরাজী পড়াইল। তাহার পর সুনীতি সংস্কৃত কলেজে বেদ পড়িতে গেল। বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া খাবার খাইয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেল। কোনও কোনও দিন মৃন্ময়ীও সুনীতির সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে যাইত।

সন্ধ্যার পর সুনীতি পাঠাগারে গেল। রান্না হইয়া গেলে মৃন্ময়ী তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইল। আহারান্তে সুনীতি উপরে শয়নকক্ষে গেল। শয্যায় শয়ন করিয়া সে দরজার দিকে উৎসুক ভাবে চাহিয়া রহিল। অবশেষে মলের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মৃন্ময়ী কক্ষে

প্রবেশ করিল। হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ ও সীতারামের ছবির নিকট গিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া মৃন্ময়ী শয়ন করিতে গেল। তাহার পর উভয়ে অনেকক্ষণ জাগিয়া এবং শেষ রাত্রে অল্পক্ষণ ঘুমাইয়া নব বিবাহিত জীবনের অপার্থিব সুখপূর্ণ আর একটী রাত্রি কাটাইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।
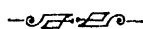
দাম্পত্যকলহ

মধ্যাহ্ন আহার শেষ করিয়া সুনীতি ও মৃন্ময়ী শয্যায় শয়ন করিয়াছে। মৃন্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমরা যে সারদার জন্য পাত্র দেখিতে গিয়াছিলে তাহার কি হইল?"

নারায়ণের ভগ্নীর নাম সারদা।

সুনীতি বলিল, "পাত্র দেখিয়া আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে। তাহারাও মেয়ে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে। টাকা কড়ি তাহারা বেশী চাহিবে বলিয়া বোধ হয় না। যা চাহিবে আমি দিতে পারিব।"

মৃ। তাহা হইলে শীঘ্র বিয়ে বাড়ী লাগিয়ে দিতেছ?

সু। হ্যাঁ এই মাঘ ফাল্গুন মাসের মধ্যেই। আমাদের বাড়ীতেই বিয়ে হবে। নারায়ণদের বাড়ীতে লোকজন দাঁড়াবার যায়গা নাই। বিয়ের কাজ কর্ম্ম শেষ হ'লে আমাকে কয়েক দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে।

মৃ। কোথায় যাবে ?

সু। আমি অনেক দিন থেকে ভাব্‌ছি একবার কাকাবাবুর বাড়ীর খবর লইতে যাইব।

মৃ। এখান থেকে কতদূর ?

সু। বেশী দূর নয়। রেলে এখান থেকে পাঁচ ছয় ঘণ্টার পথ।

মৃ। তাঁহাদের বাড়ীতে কে কে আছেন ?

সু। কাকাবাবু ত অনেক দিন হ'ল মারা গেছেন। খুড়ীমা, অনুকূল দাদা, ও কাকাবাবুর মেয়ে মতি—এদিকে ত দেখে এসেছিলাম।

মৃ। তোমার খুড়ীমা তোমাকে ভাল বাসিতেন না, ত যাবার দরকার কি ?

সু। তিনি ভালবাসুন আর নাই বাসুন তাঁদের অন্নে যখন প্রতিপালিত হয়েচি তখন তাঁদের খবর নেওয়া আমার উচিত। এখন হয় ত তাঁদের অভাব হয়েচে, হয় ত আমার দ্বারা তাঁদের কোন উপকার হ'তে পারে।—তুমি সে কয়দিন তোমার মায়ের কাছে থাক্‌বে।

মৃন্ময়ী গম্ভীর ভাবে বলিল, "না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

সুনীতি বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "একেবারে ঠিক করে ফেলেচ দেখ্‌ছি ?"

মৃ। হুঁ।

সু। কতদিন ঠিক হয়ে গেল ?

মৃ। সেই তুমি যখন ঠিক করেছিলে যে তুমি যাবে, তখন থেকে ঠিক হয়েচে যে আমিও যাব। তখন অবশ্য আমি জানিতাম না। তারপর তুমি যখন বল্লে যে যাবে, তখন আমি দেখ্‌লাম যে আমারও যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে।

সু। বা বেশ রসিকতা শিখেছ দেখ্‌ছি।

মৃ। ছাত্র ভাল শিখ্‌লে সে মাষ্টার মশায়েরই বাহাদুরী।

সু। ঠাট্টা নয় মিনু তোমার যাওয়া কি করে হ'তে পারে?

মৃ। আচ্ছা বল কি অসুবিধা হবে?

সু। তাঁরা সেখানে আছেন কি না জানা নাই। একবারে তোমাকে নিয়ে গিয়ে উঠ্‌ব? যদি দেখি তাঁরা কেউ নাই, দেশে চলে গেছেন?

মৃ। তা হ'লে তোমার সঙ্গে রেলে করে ফিরে আস্‌ব।

সু। না তা কর্ত্তে হবে না, সেখানে আশ্রয় পেতে পারি এমন অন্য স্থান আছে।

মৃ। তা হ'লে ত কথাই নাই।

সু। দেখ তাঁদের বাড়ী তেমন বড় নয়, শোবার জায়গা টায়গা ভাল নাই।

মৃ। তা হ'লে তোমার ত বড় অসুবিধা হবে।

সু। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি গাছের তলায় নৌকার উপর রাত কাটিয়েছি। হঠাৎ বড়লোক হয়ে আমার মাথা ঘুরে যায় নি। আমি কোথাও একটু মাথা রাখ্‌বার যায়গা করে নিব এখন।

মৃ। তোমার পায়ের তলায় আমারও একটু মাথা রাখ্‌বার যায়গা হবে। আমার শরীর ত হাতীর মত নয় যে অনেকখানি যায়গা দরকার।

সু। দেখ কাকীমা আমাকে ত তেমন স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। তিনি যে খুব সাদর অভ্যর্থনা কর্‌বেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পার্‌ছি না। এমন যায়গায় কি তোমাকে নিয়ে যাওয়া ভাল?

মৃ। তোমারই যদি অনাদর হ'ল তা হ'লে আর আমার অনাদর হ'তে কি বাকি রইল? না গো আমি তোমার সঙ্গে যাব আমার

বারণ ক'রো না। পরের বাড়ী ত যাচ্ছি না। তোমার নিজের কাকা। আমি কি তাঁদের কেউ নই?

সুনীতি মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। সে একা যাবে অনেকদিন থেকে তাহাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সহসা সে তাহার সংকল্প পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। অনেক প্রকৃত ও কাল্পনিক অসুবিধার কথা তাহার মনে হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আপত্তি বেশ প্রকাশ করিয়া বলা গেল। কিন্তু তাহার মনে হইল যে এগুলি ছাড়া আরও অনেক আপত্তি আছে, সেগুলি সে ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছে না। মোট কথা সে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল যে, মৃন্ময়ীর যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না।

এই রকম ভাবিয়া সুনীতি কিছু রুক্ষ স্বরে বলিল, "তোমার সহিত তর্ক করিতে যাওয়াই আমার অন্যায়। কথায় তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। তোমাদের জন্য কোনও কাজ কর্‌বার যো নাই দেখিতেছি। সম্ভব অসম্ভব না বুঝিয়া যত রকম বায়না তোমরা ধরিয়া বসিবে। কিন্তু যতই বল একথা ঠিক বলিয়া জানিও যে তোমার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না।"

এই কথাগুলির মধ্যে যে অনাদরের ভাব নিহিত ছিল তাহা মৃন্ময়ীর হৃদয়ে আঘাত করিল। অভিমানে তার নীচের ঠোঁটটি ফুলিয়া উঠিল, তাহার নাসাগ্র কাঁপিতে লাগিল এবং নেত্রপ্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

মৃন্ময়ীকে নিরুত্তর দেখিয়া সুনীতি তাহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল অভিমানের সকল লক্ষণ গুলিই প্রকাশ পাইয়াছে। সুনীতি তখন তাহাকে আদর করিল, বলিল যে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, এবং অভিমান ভাঙ্গাইবার যে সকল উপায় প্রসিদ্ধ আছে সে সকল অবলম্বন

করিল। তাহার সত্য সত্যই যেন মনে হইল বাস্তবিকই ত মিনুকে লইয়া গেলে এমন কি অসুবিধা হইবে? কেমন তাহারা এক গাড়ীতে বসিয়া নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে যাইবে।

প্রসিদ্ধ প্রতিকারগুলি ভাল করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে কখনও ব্যর্থ হয় না, এখানেও হইল না। নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু শুকাইতে না শুকাইতেই মৃন্ময়ীর মুখখানি মধুর হাসিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বর্ষাসিক্ত প্রকৃতির উপর বৈকালে সূর্য্যের মৃদু আলোক পড়িলে যেমন সুন্দর দেখায়, মৃন্ময়ীর মুখখানি তেমনিই সুন্দর দেখাইল। সুনীতি আদর করিয়া মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইল।

এমন সময় ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া কে ডাকিল, "দিদি" "দিদি"।

"খোকা আসিয়াছে" বলিয়া মৃন্ময়ী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। স্কুলের খাতা বই ও ছাতা হাতে করিয়া খোকাবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মৃ। কি রে তুই আজ ইস্কুল থেকে এত সকালে চলে এলি?

খো। আজ আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে গেল। কে না কি লাটসাহেব ছিল, সে মরে গেছে। বিলাত থেকে খবর এসেছে।

মৃ। আহা এতখানি রোদে হাঁটিয়া মুখ লাল হয়ে গেছে।

এই বলিয়া মৃন্ময়ী খোকার হাত থেকে বইগুলি লইয়া টেবিলের উপর রাখিল। পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিয়া দিল এবং নিজের অঞ্চল দিয়া তাহার ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ গল্পের পর সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা এই রবিবার আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?"

খো। কোথায় যাবেন? বোট্যানিক্যাল গার্ডন্?

সু। না, পেনেটি।

খো। সে কোথায়?

সু। পেনেটি খুব কাছে। শিয়ালদহে রেলে চড়িয়া সোদপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়। সেখান থেকে মিনিট কুড়ির পথ। ঠিক গঙ্গার ধারে। ভারি সুন্দর যায়গা।

খো। সেখানে কি আছে?

সু। পুরী থেকে আসিবার সময় চৈতন্যদেব যে ঘাটে নেমেছিলেন সে ঘাটটি এখনও আছে। ঘাটের উপরেই সেই সময়কার বহু পুরাতন বটগাছ আছে। গোস্বামী রঘুনাথ দাসের গল্প তোমাকে সেদিন বলিয়াছিলাম। নয় লক্ষ টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তি ও সংসারের সকল সুখ ছাড়িয়া তিনি চৈতন্যদেবের কৃপা পাইবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভুর শরণ লইয়াছিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু এই বটগাছের তলায় বসিয়াছিলেন। তিনি ঠাট্টা করিয়া রঘুনাথ দাসকে বলিলেন "তুমি এতদিন আমার নিকট আসিয়া ধরা দাও নাই। গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। তোমার এই দণ্ড হইল যে এখানে যত বৈষ্ণব উপস্থিত হইয়াছেন, সকলকে চিঁড়া দই দিয়া উত্তম করিয়া খাওয়াও।" এখনও প্রতিবৎসর সেই দণ্ডমহোৎসব হইয়া থাকে। তাহাকেই বলে 'পেনেটির মহোৎসব'।

"এ ছাড়া চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের ঠাকুর মদনমোহন আছেন। তাহার পাশেই রাঘব পণ্ডিতের সমাধি রহিয়াছে। তাঁহার দোলমঞ্চের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।"

খোকা উৎসাহের সহিত জানাইল যে সে নিশ্চয়ই যাইবে। কেবল তাহার মায়ের অনুমতির অপেক্ষা রহিল।

ততক্ষণ মৃন্ময়ী খোকার জন্য এক গ্লাস সরবৎ তৈয়ার করিয়া

আনিয়াছিল। খোকা সরবৎ খাইল। মৃন্ময়ী তাহার জন্য খাবার আনিতে গেল।

বৈকাল পর্য্যন্ত খোকা সেখানে গল্প করিতে লাগিল। যাইবার সময় সে বলিল, "মা বলিয়া দিয়াছেন তোর দিদিকে আর জামাইবাবুকে কাল রাত্রে নিমন্ত্রণ করে আসিস্।"

সুনীতি বলিল, "বাঃ আসল কথাই যে খোকাবাবু এতক্ষণ বলেন নাই।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সভ্যতা

নারায়ণের ভগিনীর সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মঙ্গলবারে বিবাহ। বলা বাহুল্য সুনীতি সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিবে। বিবাহ সুনীতিদের বাটীতেই হইবে। এজন্য নারায়ণ যখন তাহাদের কটুম্বদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইল, তখন সুনীতিও তাহার সঙ্গেই চলিল।

কলিকাতায় নারায়ণের পিসে মহাশয় থাকিতেন। তিনি খুব বড় লোক। কিন্তু ইংরাজি ফ্যাশনের। নিজের পরিবারবর্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। নারায়ণদের সংসারে যে অতিকষ্টে দিনপাত হইতেছে, এ কথা তিনি জানিয়াও উদাসীন। তাহাদিগকে কোনও রূপ সাহায্য করিবার কথা তাঁহার কখনও মনে উদয় হয় নাই। নারায়ণ কিম্বা তাহার পিতাও এই ধনী কুটুম্বের দ্বারে কখনও প্রত্যাশী হইয়া যান

নাই। তাহাদের অবস্থার এরূপ পার্থক্য থাকিলেও বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে পরস্পর যাওয়া আসা ছিল।

বাটীর সম্মুখে এক সুবৃহৎ ফটক। ফটকের উভয় স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া একটী লতার ঝাড় অর্দ্ধবৃত্তাকারে বাহিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে অসংখ্য লাল ও সাদা রংয়ের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়াছিল। ফটক পার হইয়াই বাগান। নানা প্রকারের বিলাতী ফুল ও পাতাবাহারের গাছ; মাঝখানে একটী ফোয়ারা হইতে জল সবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। ফোয়ারার পাশে একটী মর্ম্মর গঠিত অর্দ্ধনগ্ন রমণীমূর্ত্তি। বাগান অতিক্রম করিয়া উভয়ে মার্ব্বেলের সোপান আরোহণ করিয়া প্রাসাদতুল্য বাটীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখে হ্যাট রাখিবার বিচিত্র আল্‌না। বৈঠকখানা ঘরের সম্মুখে মূল্যবান্ পর্দ্দা বিলম্বিত। পর্দ্দা সরাইয়া তাহারা ঘরে প্রবেশ করিল। ভূমির উপরে একটী পুরু গালিচা পাতা। নানা আকারের সোফা চারিদিকে সাজান আছে। কক্ষের একপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটী দর্পণ। সহসা ঢুকিলে মনে হয় দেওয়ালের অপর পার্শ্বে এই রকম সাজান আর একটী ঘর আছে। কিন্তু নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিলে সে ভ্রম দূর হয়।

সুনীতি ও নারায়ণ অপেক্ষাকৃত আড়ম্বর বিহীন দুইটি বসিবার আসন গ্রহণ করিল। টেবিলের উপর কাগজ ও পেনসিল ছিল। নারায়ণ নিজের নাম লিখিয়া 'বেয়ারার' হাতে দিল। তাহার পরে উভয়ে নীরবে প্রাচীরবিলম্বী বিলাতী চিত্রগুলি দেখিতে লাগিল। কোথাও একদল অশ্বারোহী শিকারী একটা শিয়ালকে তাড়া করিয়াছে, কোথাও যুদ্ধ হইতেছে, কোথাও স্নানশীল অর্দ্ধনগ্ন রমণীমূর্ত্তি। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে শব্দ পাওয়া গেল, তাহার পর ভিতরের দরজা খুলিয়া একটী যুবাপুরুষ ঘরে প্রবেশ করিলেন।

যুবকের পরিধানে ঢিলে ইজের, গায়ে আল্‌গা কোট, ও পায়ে পম্প্‌সু, মাথার উপর চুলগুলি এরূপ ফ্যাসনে কাটা যে কলিকাতার সৌখীনতম গাড়োয়ানকেও যুবকের নিকট পরাস্ত মানিতে হয়। পশ্চাৎভাগের ও পাশের চুলগুলি এত ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হয়। মনে হয় যেন পশ্চাদ্‌ভাগে প্রকাণ্ড টাক পড়িয়াছে। সামনে বড় বড় চুল রাখিয়া তাহার ক্ষতি পূরণ হইয়াছে। চুলগুলি পমেটমের সাহায্যে চিক্কণ করা হইয়াছে এবং বহু বিচিত্র আকারে তরঙ্গায়িত হইয়াছে। গোঁপ দাড়ি পরিষ্কার ভাবে কামান। মুখে একটী চুরুট।

যুবকটি গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল "Hallo Naran! How do you do [১] ?" নারায়ণ তাহার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিল "আমরা ভাল আছি। আপনাদের বাড়ীর সব কুশল ত?"

যুবক উত্তর করিল "So so. [২]"

নারায়ণ তথন সুনীতির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া যুবককে বলিল, "ইনি আমার বন্ধু শ্রীযুক্তবাবু সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়।"

"Good morning. I am so glad to meet you [৩] " বলিয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। সুনীতি নমস্কার করিবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু ভাব গতিক দেখিয়া মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়া হাত বাড়াইয়া দিল।

---

(১) "এই যে নারায়ণ! তুমি কেমন আছ?"

(২) "এই এক রকম আছি।"

(৩) "সুপ্রভাত! আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।

নারায়ণ বলিল, "আগামী ২৩শে ফাল্গুন সারদার বিয়ে। তাই আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি।"

যুবক। Bless me if I know the Bengali months. They are always a puzzle to me. ১

নারায়ণ। এই আস্‌ছে মঙ্গলবার ২৩শে ফাল্গুন।

যুবক। So the little girl is going to be a bride. Where does the bridegroom come from ? ২

নারায়ণ। তাঁহাদের বাড়ী বৰ্দ্ধমান জেলায়—পল্লীগ্রামে।

যু। Oh the villages of Bengal—hot beds of malaria. Full of snakes, mosquitoes, and dirty water. No sort of amusement, theatre or bioscope or horse-race. To banish a young life there,—it is awful ! ৩

বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম গুলির এই স্তুতিবাদ শুনিয়া সুনীতি ও নারায়ণ মনে মনে হাসিতে লাগিল। অনন্তর নারায়ণ বলিল, "পিসীমাকে একবার প্রণাম করে যাব।"

যুবক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "All right. Come in." ৪ এই

---

(১) "আমি যদি বাঙ্গালা মাসগুলি জানিতাম তাহা হইলে ভাবনা থাকিত না। বাঙ্গালা মাস আমি কিছুতেই ঠিক করিতে পারি না।

(২) "ছোট মেয়েটি তা হ'লে বউ হইতে চলিল। বরের বাড়ী কোথায় ?"

(৩) "বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলি কি ভয়ানক যায়গা। ম্যালেরিয়ার বাসভূমি। সাপ, মশা ও ময়লা জলে পরিপূর্ণ। কোনও প্রকার আমোদের বন্দোবস্ত নাই—থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড় দৌড় কিছুই নাই। এমন যায়গায় একটী নবীন জীবনকে নির্ব্বাসিত করা কি ভয়ঙ্কর কথা !"

(৪) "বেশ কথা। ভিতরে এস।"

বলিয়া যুবক পথ দেখাইয়া চলিল। নারায়ণ তাহার পশ্চাতে চলিল। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণ ফিরিল। তখন উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। এই অদ্ভুত যুবকের বিজাতীয় ভাষা, ভাব ও পরিচ্ছদ দেখিয়া সুনীতির মনে ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। সে বলিল, "কি আশ্চর্য্য, ভদ্রলোক যাহা কিছু আমাদের বাঙ্গালীদের জিনিষ তাহা অতি যত্ন করিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন। আমি ভাবিতেছি উঁহাকে কেহ পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বাঙ্গালীর নাম বলিতে নিশ্চয়ই উঁহার লজ্জা হইবে। উনি হয় ত সাহেবের নাম বলিতে পারিলে সুখী হইবেন। এত সাহেব কি করিয়া হইল ? তোমার পিসে ম'শায়ও এমনি না কি ?"

না। না পিসে ম'শায় এতদূর নন। ব্যবসায় উন্নতি করিয়া তিনি বড়লোক হইয়াছেন। তিনি যখন বাড়ীর বাহিরে যান তখন সাহেব সাজেন, কিন্তু বাড়ীর ভিতর ধুতিই পরেন।

যু। এইখানে দেখ মাড়োয়ারিদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের প্রভেদ। ব্যবসায় উন্নতি করিয়া কত মাড়োয়ারি ক্রোরপতি হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বোধ হয় একজনও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা সাহেবও সাজে না, হোটেলে বসিয়া অখাদ্যও খায় না, ছেলেমেয়েদের জন্য বিলাতী দুশ্চরিত্র ধাত্রী রাখিয়া নিজেদের আচার ব্যবহার ভুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে না। কলিকাতার ব্যবসাটি যদি মাড়োয়ারিদের হাতে না থাকিয়া বাঙ্গালীদের হাতে থাকিত, তাহা হইলে কতকগু'ল বেশী সাহেব ও বিধর্ম্মীর সৃষ্টি হইত মাত্র। কিন্তু মাড়োয়ারিরা দেখ কত দাতব্য চিকিৎসালয়, কত পান্থনিবাস, ধর্ম্মশালা, দেবালয় পিঞ্জরাপোল প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে তাহাদের অর্থব্যয় করিতেছে। দামোদরের ভীষণ বন্যায় যখন পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধিশালী জনপদ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তখন কলিকাতা হইতে বাঙ্গালী সাহায্যকারীর দল

সেই সকল বিপন্নস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহাদের পূর্ব্বেই মাড়োয়ারিরা সেস্থলে উপস্থিত হইয়া অসহায় লোকদিগকে চাউল বিতরণ করিতেছে। বিপন্নের দুঃখমোচনে মাড়োয়ারি সহায়ক-সমিতি অনেক কাজ করিয়াছে, যদিও তাহারা এত বিজ্ঞাপন করে না।—আচ্ছা তোমার এই পিস্‌তুতো দাদা ইনি গোড়া থেকেই এমনি সাহেব?

না। না, আগে ইনি বাড়ীতে ধুতি পরিতেন, এবং বাঙ্গালাতেও মাঝে মাঝে কথা বলিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহার সম্বন্ধী বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন ও মেম বিবাহ করিয়াছেন সেই হইতে ইনি বাঙ্গালীর ভাষা ও পরিচ্ছদ একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। শুনিয়াছি সে মেমও মাঝে মাঝে মাথায় সিন্দূর দিয়া শাড়ী পরেন, এবং অনেক চেষ্টা করিয়া অল্প অল্প বাঙ্গালা কথা বলিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু মেমের স্বামী ও মেমের ঠাকুরজামাই—ইঁহারা উভয়ে যাহা কিছু বাঙ্গালী তাহাই বর্জ্জন করিয়াছেন।

সু। কেবল বাঙ্গালী বাপ মা এখনও বর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

এই বলিয়া দুইজনে হাসিতে লাগিল।

অতঃপর নারায়ণের জ্যাঠাম'শায়ের বাড়ী যাইতে হইবে। তিনি অধ্যাপক পণ্ডিত মানুষ। কলিকাতার কোনও বড়লোক তাঁহার জন্য একটী টোল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। টোলে কয়েকটী ছাত্র থাকে। একতালা বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে একটা নাতিক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটী তুলসীমঞ্চ একপাশে একটি গাই বাঁধা আছে। সুনীতি ও নারায়ণ যখন সেখানে উপস্থিত হইল তখন তাঁহার বালিকা কন্যা গরুটিকে খাওয়াইতেছিল এবং তিনি গরুর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। অধ্যাপকের প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া সুনীতির হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। নারায়ণকে দেখিতে পাইয়া তিনি প্রসন্নমুখে অভ্যর্থনা করিয়া

তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। নারায়ণ এবং সুনীতি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বালিকা আসিয়া নারায়ণ দাদাকে প্রণাম করিল। নারায়ণ তাহার জ্যেঠামশায়ের নিকট সুনীতির পরিচয় দিল। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার কন্যাকে রকের উপর মাতুর পাতিয়া দিতে বলিলেন। মাতুর পাতা হইলে সকলে মিলিয়া বসিলেন। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর নারায়ণ তাহার ভগিনীর বিবাহের কথা বলিল।

কিছুক্ষণ পরে নারায়ণ বাড়ীর ভিতর গেল। সুনীতি নারায়ণের জ্যেষ্ঠতাতের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। কথায় কথায় পুরোহিত ব্রাহ্মণদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা উঠিল। পণ্ডিত মশাই বলিতে লাগিলেন,—

"ইঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। ক্রিয়াকর্ম্ম পূজা-পার্ব্বণ যেন উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহাদের টাকাকড়ি আছে তাঁহাদের ধর্ম্মে মতি নাই, যাঁহাদের ধর্ম্মে মতি আছে তাঁহাদের টাকা নাই। বিবাহ উপনয়ন ও শ্রাদ্ধ—যাহা না করিলেই নয়, সেইসকল ক্রিয়া উপলক্ষে ইঁহারা বহুদিন অন্তর যৎসামান্য যাহা পাইয়া থাকেন তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করা একপ্রকার অসম্ভব। সমাজ এ বিষয়ে উদাসীন। আমাদের সমাজের যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহারা কি ইহা চান না, যে পুরোহিতেরা মন্ত্রসকল বিশুদ্ধ-ভাবে উচ্চারণ করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে আমাদের পূজা-পার্ব্বণ ও সামাজিক ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন করেন? যদি চাহেন তাহা হইলে তদুপযোগী কি ব্যবস্থা করিতেছেন? পুরোহিত-দিগের প্রতি সমাজ আজকাল যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাতে কোন আত্মমর্য্যাদাভিমানী ব্যক্তি পৌরোহিত্যে ব্রতী থাকিতে পারেন না। আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক পুরোহিতদিগকে অজ্ঞতার জন্য বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে এই

অজ্ঞতার জন্য সমাজই দায়ী। সমাজ তাঁহাদিগকে অধ্যয়নের সুযোগ ও যথেষ্ট উৎসাহ দেন না, সেইজন্যই এইরূপ হইয়াছে। সেদিন আমার পরিচিত একটী পুরোহিত বলিতেছিলেন, তাঁহার এক বিশিষ্ট যজমানের পুত্রের কঠিন পীড়া হইয়াছিল। যজমান তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন 'আমার পুত্রের আরোগ্যের জন্য আপনি প্রত্যহ কালীঘাটে মায়ের বাড়ীতে এক বা দুইরূপ চণ্ডীপাঠ করুন।' পুরোহিত প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করিতেন। তাঁহার সাধ্যমত ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত তিনি এক মাসকাল শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। এদিকে বহু অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কালক্রমে বালক রোগমুক্ত হইল। তখন বালকের পিতা পুরোহিতকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ডাক্তার ও ঔষধে অনেক খরচ হইয়া গিয়াছে। তাই ইহার চেয়ে বেশী দিতে পারিলাম না। মার্জ্জনা করিবেন।" একমাসের পারিশ্রমিক ৫৲, প্রত্যহ ৵১০ করিয়া পড়ে। বেলা বারটা একটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনাহারে থাকিয়া ক্রিয়া করিতে হইয়াছে, অন্য কার্য্যও তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে। যজমান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। চিকিৎসায় তাঁহার ৫০০৲ ব্যয় হইয়া গেল, পুরোহিতকে বিদায় করিবার সময় ৫৲ টাকা দিয়া ব্যয় সংক্ষেপ না করিলে আর চলিল না। পুরোহিত ভাবিলেন তিনি টাকা কয়টি প্রত্যর্পণ করিয়া আসিবেন। কিন্তু ইহাতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় এবং জোর করিয়া বেশী আদায় করিবার চেষ্টা মনে হইতে পারে বলিয়া তিনি নীরবে চলিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ যখন আমাকে এই কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠ আবেগ রুদ্ধ হইয়াছিল। নেত্রপ্রান্ত হইতে তিনি দুই ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। এই অবস্থায় পুরোহিতদিগকে জীবন কাটাইতে হয়। কম কষ্টে কি তাঁহারা ছেলেদিগকে ইংরাজী

পড়াইয়া কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। কুল ক্রমাগত ব্যবসায় ছাড়িতে তাঁহাদের নিরতিশয় কষ্ট হইতেছে। কিন্তু কি করিবেন? সমাজ যদি তাঁহাদিগকে না চায় তাহা হইলে তাঁহাদের উপায় কি?"

এতক্ষণ নারায়ণ বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের নিকটে বসিয়াছিল। পূর্ব্বদৃষ্ট বালিকাটি রকের উপর একটী স্থান পরিষ্কার করিয়া আসন পাতিয়া একটী রেকাবে খাবার আনিয়া রাখিল। নারায়ণের জ্যেঠা-মহাশয়ের অনুরোধে সুনীতি জলযোগ করিল। অনন্তর প্রণাম করিয়া তাহারা বিদায় গ্রহণ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জলপথে

সারদার বিবাহ হইয়া গেল। দিনকতক আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত হইল। তাহার পর সুনীতি তাহার কাকার বাড়ী যাইবার বন্দোবস্ত করিল। কৃষ্ণমোহনবাবু এখন বিদেশে—তিনি প্রায়ই কোনও তীর্থে থাকেন। সুনীতিকে বাড়ী বন্ধ করিয়া যাইতে হইবে।

স্থির হইয়াছিল তাহারা নৌকা করিয়া যাইবে। ভাল একটা বজরা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। গঙ্গার উভয় পার্শ্বে অনেক সুন্দর ও প্রাচীন স্থান আছে। অনেকদিন হইতে সুনীতির সেই সব জায়গা দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিন সকালবেলা তাহারা আহিরীটোলার ঘাটে গিয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িবার পর মৃন্ময়ী জানালার ধারে বসিয়া খুব উৎসাহের সহিত দেখিতে লাগিল। নদীর উপর কত নৌকা। ঘাটে কত লোক স্নান করিতেছে। গঙ্গার উভয় তীরে সুন্দর সুন্দর কত বাড়ী। মাঝে মাঝে কলের দীর্ঘ চিমণি। গঙ্গার বিশাল প্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় তরঙ্গায়িত। ষ্টীমারগুলি বংশীধ্বনি করিতে করিতে ঢেউ তুলিয়া ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের নৌকা দাঁড় টানিয়া চলিল। নদীর জল নৌকার গায়ে লাগিয়া তরতর শব্দ করিতেছিল।

কাশীপুর ও বরাহনগর পার হইয়া গেল। গঙ্গাতীরে প্রায়ই বাগানবাড়ী বা মন্দির দেখা যাইতেছিল। ক্রমে বামে বালি ও উত্তরপাড়ার গৃহ ও ঘাটগুলি দেখা গেল। দূর হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখা যাইতেছিল। সুনীতি দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকা রাখিতে বলিল। তাহারা স্নান করিয়া মন্দির, পঞ্চবটী ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের থাকিবার ঘর দেখিয়া আসিল।

দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়াই শিবুতলা ষ্টীমার ঘাট। ষ্টীমার ঘাটের নিকটেই সুনীতি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর গদাধর দাসের পাটবাড়ী দেখিতে গেল। এখানে গদাধর দাসের সমাধি আছে। নিত্যানন্দ এখানে দানখণ্ড লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। এখানে একটী ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহাতে গৌর নিতাই বিষ্ণুপ্রিয়া ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। স্থানটি ঠিক গঙ্গার উপরেই অবস্থিত ও অতি মনোরম।

এখান হইতে তাহারা পানিহাটি আসিয়া পৌঁছিল। শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিবার পথে মহাপ্রভু যখন এই ঘাটে নামিয়াছিলেন, সেদিন এখানে কি সমারোহ ও ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল। সেই ঘাটের নিকট নৌকা রাখিয়া তাহারা ঘাট হইতে অনতিদূরে ভক্তপ্রবর রাঘবপণ্ডিতের সমাধি দেখিয়া আসিল।

গঙ্গার পূর্ব্বতীরের স্থানগুলি মহাপ্রভুর কত পবিত্র স্মৃতির সহিত সংযুক্ত! সন্ন্যাস লইয়া শ্রীক্ষেত্র যাইবার পথে মহাপ্রভু এই পথ দিয়া পদব্রজে গিয়াছিলেন। আবার বহুদিন পরে তিনি যখন নৌকাযোগে এই পথে ফিরিতেছিলেন তখন সেই অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ মূর্ত্তি এবং সেই মধুর কণ্ঠের হরিনাম শুনিতে গঙ্গার উভয় তীরে অসংখ্য লোক সমবেত হইত।

সুমধুর কণ্ঠস্বরে প্রসন্ন বদনে হেরে,
"কৃষ্ণ" বলি গৌর ভগবান।
নৌকাপরে বসি যায় অনিমিখ নেত্রে চায়
দুকূলে যতেক ভাগ্যবান॥
প্রভু চলে গঙ্গাজলে লোক সব দুই কূলে
উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি।
বাল বৃদ্ধ নরনারী সবে বলে হরি হরি
ব্যাপিলেক আকাশ অবনী॥

যেখানে তিনি নৌকা হইতে নামিলেন সেখানে আরও সমারোহ হইত।

সে স্থানের ধূলি নিতে লোক যায় শতে শতে
গর্ত্তময় হয় ক্রমে ক্রমে।

পাণিহাটির নিকটেই খড়দহ। নৌকা ব্যারেকপুর ও শ্রীরামপুর পার হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তীরের দৃশ্য অস্ফুট হইয়া আসিল। নদীবক্ষে ইতস্ততঃ নৌকার উপর আলো জ্বলিল। একটু পরে তাহারা নৈহাটি পৌঁছিল। নৈহাটিতে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

প্রত্যূষে নৌকা নৈহাটির ঘাট হইতে রওনা হইল। বাঁশবেড়িয়াতে

হংসেশ্বরীর মন্দির দেখিয়া তাহারা ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান করিল। সারাদিন নৌকা চলিল। দুই পাশে কত গ্রাম, ঘাট, মন্দির দেখা গেল। ছেলেমেয়েরা গঙ্গার জলে নামিয়া খেলা করিতেছে; রমণীগণ গৃহকর্ম্ম করিতেছে, ঘাট হইতে জল লইয়া যাইতেছে; রাখাল বালকগণ মাঠের উপর গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিতেছে। ক্রমে বৈকাল হইল। স্নিগ্ধ পবন বহিল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যকিরণে নদীতীরের দৃশ্যগুলি আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। সুনীতি মৃন্ময়ীকে বলিল, "দেখ আমাদের কেমন সুন্দর দেশ রহিয়াছে। আর এই যে সব গ্রামের লোক ইহারা আমাদের আপনার লোক, আমাদের পরম আত্মীয়। কলিকাতায় বসিয়া তুমি কি ইহা জানিতে পারিয়াছিলে?"

সন্ধ্যার সময় তাহারা কালনা পৌঁছিল। পরদিন সকালে কালনার মন্দির ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া আসিল। তাহারা যখন নৌকায় উঠিয়াছে তখন একজন ভিখারী আসিয়া গান ধরিল,—

এখনও ফের্ ও আমার মন
এখনও তোর সময় আছে
যখন শমন এসে ধরবে কেশে
(তুই) শরণ নিবি কার কাছে।
ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ রে মন
এইটে তুই বুঝলি না রে?
(ওরে) তুই যে ব্রহ্মময়ীর পুত্র
(এতে) তৃপ্তি কি তোর হ'তে পারে?
(একবার) 'মা' বলে তুই ডাক দেখি মন

ব্যাকুল হয়ে কাতর স্বরে
(দেখি) কোন্ প্রাণে মা লুকিয়ে থাকে
দেখা না দেয় সন্তানেরে।
(বল্) চাই না সুখ মা চাই না অর্থ
চাই না বিদ্যা চাই না কারে;—
চাই শুধু মার চরণ যুগল
কোন্ প্রাণে মা দিবে নারে?
পাগল কহে পাবি রে মন
নিরাশ নাহি হবি শেষে
(তবে) এইটে তুই দেখবি,—মনে
কুবাসনা নাহি পশে॥

সুনীতি তাহাকে আরও গান গাহিতে বলিল। সে দেহতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি গান গাহিল। তাহাকে একটী টাকা দিয়া সুনীতি নৌকা ছাড়িতে বলিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা নবদ্বীপ পৌছিল। পরদিন নবদ্বীপেই কাটিল। মহাপ্রভুর পবিত্র জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলির স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে দিন শীঘ্রই অতিবাহিত হইল। দিবাবসানে নগরের অসংখ্য দেবালয় হইতে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতে সান্ধ্যবায়ু পরিপূর্ণ হইল। সোণার গৌরাঙ্গ মন্দিরের আরতি দেখিয়া তাহারা নৌকাতে ফিরিয়া আসিল। খুব ভোর বেলা নৌকা ছাড়িল। বৈকালেই কাটোয়া পৌছিল। মৃন্ময়ীকে নৌকাতে রাখিয়া সুনীতি তাহার কাকার বাড়ী গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। পশ্চিমে গৃহ এবং বৃক্ষরাজির পশ্চাতে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন। গরুর দল মাঠ হইতে ফিরিতেছে।

তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিতে আকাশ ধূসরবর্ণ হইয়াছে। পথের ধারে ছেলেরা কোলাহল করিয়া খেলিতেছে। এবং গৃহস্থ বধূগণ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া কক্ষে জলের কলস লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিতেছে। এইসময়ে সুনীতি তাহার বাল্যের বহু স্মৃতিজড়িত নগরে প্রবেশ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দশান্তর

যেস্থানে আমাদের বাল্যকাল কাটিয়াছে বহু বৎসরের দীর্ঘ অদর্শনের পর সে স্থান দেখিলে আমাদের মনে বহু বিচিত্রভাবের উদয় হয়। সুনীতি যখন তাহার কাকার বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন এই ভাবের বিচিত্র অনুভূতিতে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই পরিচিত দরজা পুরাতন বন্ধুর ন্যায় উন্মুক্ত হৃদয়ে সুনীতিকে যেন আহ্বান করিতেছিল। সুনীতি এখানে যে দিনগুলি কাটাইয়াছিল তাহাতে দুঃখ ও কষ্টের পরিমাণই বেশী ছিল, আজ কিন্তু ১০।১২ বৎসরের ব্যবধানে সে দুঃখ কষ্টগুলির তীক্ষ্ণধার অনুভব হইল না; সেগুলি বিশেষ পীড়াদায়ক মনে হইল না। এবং তাহাদের মধ্য হইতে তাহার খুড়ামহাশয়ের সদয় ব্যবহার, সহপাঠী বালকদের সহিত খেলা, এবং তাহার খুড়ীমা হয়ত মাসান্তে একবার প্রসন্নমুখে যে একটী স্নেহের কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকলের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। মানবের হৃদয় এইরূপ। আজ যাহা

ঘটিতেছে তাহা কখনই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয় না। কিন্তু দুই বৎসর পরে আজিকার সামান্য ঘটনাও সবিশেষ সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

সুনীতি চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল 'অনুকূল দাদা'—কোনও উত্তর পাইল না। উত্তরের জন্য সে নিজেও বিশেষ ব্যগ্র হয় নাই। বাল্যজীবনের শত স্মৃতি তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ বাড়ীর সম্মুখে অশ্বত্থ বৃক্ষ, চৈত্রের সান্ধ্য-সমীরণে সারাগাছময় শ্যামল পত্রগুলি ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছে—তাহার ছেলেবেলায় যেমন ভাবে কাঁপিত ঠিক্ সেইভাবে,—যেন সেই গাছের পাতাগুলি কোন্ অজানা সময় হইতে একটী গান সুরু করিয়াছে ; বৎসরের পর বৎসর কত দীর্ঘকাল ধরিয়া গাহিয়াও এখনও গানটি শেষ করিতে পারে নাই।

আরও দুই তিনবার ডাকিয়া যখন উত্তর পাইল না, তখন সুনীতি খোলা দরজার মধ্য দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কোথাও কাহাকে দেখিতে না পাইয়া সুনীতি তাহার খুড়ীমার ঘরে গেল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল ঘরের এককোণে মিট-মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, খাটের উপর একটী শীর্ণ রমণীমূর্ত্তি শয্যায় মিলাইয়া শুইয়া আছে, আর তাহার পায়ের তলায় একটী যুবতী বসিয়া রহিয়াছে। প্রথমে ইঁহারা কেহই সুনীতিকে দেখিতে পাইলেন না। অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া সুনীতি ডাকিল "খুড়ীমা"। দ্বারে অপরিচিত লোক দেখিয়া যুবতী সচকিতভাবে ঘোমটা টানিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা ?"

সুনীতি কহিল, "আমি সুনীতি।"

বিনোদিনী খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "কি বল্লি বাবা তুই সুনীতি ? এতদিন পরে আর কি দেখ্তে এলি বাপ ? দেখে যা বাবা

আমার কপাল পুড়ে গেছে, ঘরবাড়ী ছারখার হয়ে গেছে। অন্তিম শয্যায় শুয়ে তিনি যে প্রলাপের ঘোরে রোজ দশবার করে তোর নাম কর্ত্তেন। কখনও বলতেন 'সুনীতি তুই কি এলি বাপ?' কখনও বল্‌তেন 'শুনেছ, সুনীতি কেমন ভাল পাশ করেছে। সুনীতি আমাদের বংশ উজ্জ্বল কর্‌ল।' কখনও বল্‌তেন, 'হায় দাদা তুমি আজ কোথায়? তোমার কত আদরের সুনীতি আজ এত বড় লোক হ'ল তুমি দেখ্‌তে পেলে না' কখনও বা হৃদয়-বিদারক চীৎকার করে বল্‌তেন 'ঐ দেখ আমার সুনীতি দুদিন খেতে পায় নাই, পথের ধারে পড়ে আছে।' আমি পাপিনী চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদ্‌তাম। সে সময় যদি একবার আস্‌তিস্ বাবা তা হ'লে তিনি সুখে আঁখি মুদ্‌তে পার্‌তেন।" এই বলিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন।

এই করুণ কাহিনী শুনিয়া সুনীতির চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইল। খুড়ীমার পায়ের ধূলো লইয়া সে শয্যার একপাশে বসিল। খুড়ীমা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি অসুখ করেছে খুড়ীমা? অনুকূল দাদা কোথায়? খুকীর কোথায় বিয়ে হয়েছে? সে কি এখন শ্বশুর বাড়ীতে?"

খুড়ীমা বলিলেন, "দুতিন মাস থেকে অম্বলের অসুখে কষ্ট পাচ্ছি। মাঝখানে অসুখ এত বেড়েছিল যে দিনরাত চোখের পাতা বন্ধ করতে পারতাম না। অনুকূলটা কুলাঙ্গার হয়েছে—আমার পেটে ভাল ছেলে কি করে হবে? এই যে আমার এত অসুখ সে একদিন জিজ্ঞাসাও করে না 'মা কেমন আছ?' কাজ কর্ম্ম কিছুই করে না। ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় আর সেই শেষরাত্রে বাড়ী ফেরে। আহা আমার বৌমার সোণার শরীর শুকিয়ে যাচ্চে। এমন লক্ষ্মীর মত বউ এমন কুলাঙ্গারের হাতে পড়েছে!

"খুকীর শ্বশুরবাড়ী বেশী দূরে নয়। সে একরকম ভাল আছে। তুমি কোথায় বিয়ে করেছ বাবা ?"

সুনীতি বলিল, "কলিকাতায়।"

খুড়ীমা। আমরা একবার খবরও পেলাম না বাবা ?

গুরুতর ত্রুটি হইয়া গিয়াছে, সুনীতি লজ্জায় মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

খুড়ীমা। বৌমা কলিকাতায় আছেন ?

সুনীতি। আমার সঙ্গে এসেছে। আমরা নৌকায় আসিয়াছি। সে নৌকাতে আছে।

খুড়ীমা। এতক্ষণ বল্‌তে নাই বাবা ? তাঁকে শীঘ্র গাড়ী করিয়া নিয়ে এস।

অল্লক্ষণ পরে সুনীতি মৃন্ময়ীকে আনিতে গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অভ্যর্থনা

সুনীতি গাড়ী করিয়া মৃন্ময়ীকে লইয়া আসিল। দ্বারের নিকট গাড়ী থামিতেই অনুকূলের স্ত্রী ঘোমটা টানিয়া দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সুনীতি গাড়ী হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অনুকূলের স্ত্রী মৃন্ময়ীকে নামাইয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। বাড়ীর মধ্যে আসিয়া মৃন্ময়ী অনুকূলের

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল। রমণীর হাতে একটী প্রদীপ ছিল। পরিধানে মলিন বসন। অতিশয় কৃশ। মুখখানি খুব সুন্দর, কিন্তু বিষাদ মাখান, যেন অনেকদিন সুখের মুখ দেখে নাই। এই অপরিচিত রমণীকে দেখিয়া মৃন্ময়ীর হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল। এই অল্প বয়সে না জানি ইহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে।

রমণী কহিল "এস আগে মাকে প্রণাম করিবে চল।" এই বলিয়া মৃন্ময়ীকে শাশুড়ীর ঘরে লইয়া গেল। বিনোদিনী কহিলেন, "আলোটা ভাল করিয়া ধর ত বৌমা, আমি মুখখানি দেখি।" এই বলিয়া তিনি ঘোমটা সরাইয়া আদর করিয়া চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "আহা সাক্ষাৎ মা ভগবতী।" তাহার পর পুত্রবধূকে বলিলেন, "তোমার ঘরে নিয়ে চল বৌমা। কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হো'ন।"

সুনীতি গাড়ী বিদায় করিয়া তাহার খুড়ীমার ঘরে গিয়া বসিল। অনুকূলের স্ত্রী (ইঁহার নাম সাবিত্রী বালা) জলখাবার সাজাইয়া রাখিয়া শাশুড়ীর নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা জলখাবার দেওয়া হইয়াছে।"

বিনোদিনী সুনীতিকে বলিল, "ওঠ বাবা, একটু জলখাবার খেয়ে এস।"

সুনীতি কহিল, "এখন আর কিছু খাব না খুড়ীমা। একেবারে রাত্রে খাইয়া শুইব।"

বিনোদিনী কহিলেন, "তাও কি হয় বাবা? বৌমা খাবার দিয়েচেন। একটু যাহোক খেয়ে এস। না হ'লে তাঁর মনে কষ্ট হইবে।"

অতঃপর সুনীতি খাবার খাইতে বসিল। সুনীতির খাওয়া হইলে সাবিত্রী মৃন্ময়ীকেও খাওয়াইল। সুনীতি তাহার খুড়ীমার নিকটে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। সাবিত্রী রন্ধনশালায় গেল। মৃন্ময়ী তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

সাবিত্রীর কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া মৃন্ময়ী চমৎকৃত হইল। দেখিতে দেখিতে নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। মৃন্ময়ীকে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে হইল না। তবে মৃন্ময়ীকে সাহায্য করিতে ব্যগ্র দেখিয়া সাবিত্রী মধ্যে মধ্যে তাহাকে বলিল, নূনের বাটীটা দাও ত ভাই, আলুগুলো কড়াতে ফেলে দাও। সে সকল কাজ সাবিত্রী নিজেই অনায়াসে করিতে পারিতেন।

আহার প্রস্তুত হইল। সাবিত্রী আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া আসন পাতিল। মৃন্ময়ীকে বলিল, "ভাই এক গ্লাস জল দিয়া তুমি তোমার বরকে ডেকে আন।" মৃন্ময়ী জল দিয়া বলিল, "দিদি উনি খুড়ীমার কাছে বসে আছেন আমি কি ক'রে ডাক্‌ব?" তখন সাবিত্রী ঘোমটা টানিয়া তাহার শাশুড়ীর নিকট গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, খাবার যায়গা হয়েছে।"

বিনোদিনী সুনীতিকে বলিলেন, "তবে বাবা, খেয়ে এস। অনেক পথ এসেছ। শরীর ক্লান্ত হয়েছে। শীঘ্র শীঘ্র শুয়ে পড়।" সুনীতি খাইতে ব'সল। পথশ্রমে ক্ষুধার উদ্রেক বেশী হয়। সাধারণ ব্যঞ্জনগুলি অতি সুন্দর ভাবে রান্না হ'য়েছিল। সাবিত্রী পরিবেশন করিতেছে। মৃন্ময়ী কাছে দাঁড়াইয়া আছে। সুনীতি বলিল, এত সুন্দর রান্না কখনও সে খায় নাই। বাস্তবিকই তাহার ইহা মনে হইতেছিল। সাবিত্রী মৃন্ময়ীকে বলিল "তোমার বর ভাই বড় লজ্জা দিতে পারেন।" এই বলিয়া সুনীতি যে ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিতেছিলেন, মৃন্ময়ীর হাতে তাহাই পাঠাইয়া দিল।

সুনীতির খাওয়া হইল। মৃন্ময়ীও খাইল। সাবিত্রীর শোবার ঘরটি বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল। সাবিত্রী সেই ঘরে সুনীতি ও মৃন্ময়ীর জন্য বিছানা করিল। ডিবে ভরিয়া পান রাখিল। তাহার

পর মৃন্ময়ীকে বলিল, "ভাই, আজ আর দেরী ক'রো না, শুইবে চল।"

সুনীতি ও মৃন্ময়ী নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের এক পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছে। বিছানার উপর নূতন আস্তরণ পাতা, পরিষ্কার ধব্‌ধব্ করিতেছে। বিছানার ধারে জানালা দিয়া দক্ষিণ পবন ঘরে প্রবেশ করিতেছে। বিছানার পাশে স্তূপীকৃত যুঁই বেল ও রজনীগন্ধার সৌরভে ঘরটি আমোদিত হইয়াছে। যাহার স্নেহকোমল হস্ত এই সকল সুন্দর দ্রব্য সাজাইয়া রাখিয়াছিল তাহার ব্যর্থ জীবনের কথা মনে করিয়া সুনীতি ও মৃন্ময়ীর হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল। আজ তাহারা শয়ন করিবার পূর্ব্বে ভগবানকে যখন প্রণাম করিল, তখন সাবিত্রী যেন সুখী হয়,—এই প্রার্থনা তাহাদের আবেগপূর্ণ হৃদয় হইতে বারবার উত্থিত হইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সাবিত্রী

আজ তিন চারি বৎসর হইল সাবিত্রীর বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর প্রথম প্রথম সাবিত্রী তাহার স্বামীর আদর যত্ন পাইয়াছিল—কিছু অতিরিক্ত মাত্রাতেই পাইয়াছিল। অনুকূল সময়ে সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইত এবং অপর্য্যাপ্ত প্রেম সম্ভাষণে এবং এসেন্স সাবান চিরুণী প্রভৃতি উপহার দ্রব্যে বালিকা পত্নীর মনোরঞ্জন

করিতে বিধিমত প্রয়াস পাইত। স্বামীর প্রেম যে কি অমূল্য পদার্থ তাহা বালিকা সাবিত্রী তখন জানিত না। তারপর যৌবনাগমে যখন তাহার দেহলতা উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল এবং তাহার হৃদয়ে শত শত বাসনা মুকুলিত হইল, তখন সে দেখিল, তাহার স্বামী আর তাহাকে চান না। বিজন বনভূমিতে বিকশিত পুষ্পের ন্যায় সাবিত্রীর হৃদয়ের প্রেম ও সৌন্দর্য্য বিফল হইল। স্বামীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া তাহা সার্থক হইতে পারিল না। শ্বশুর বাড়ীতে সাবিত্রী সুখ পাইল না, কিন্তু সে তাহার কর্ত্তব্য ভুলিল না। তাই যখন তাহার শাশুড়ী কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইলেন, এবং অনুকূল মাতার কোনও সেবা করিত না, তখন সাবিত্রী সেবার ভার সম্পূর্ণ রূপে নিজের উপর তুলিয়া লইল। ডাক্তার আসিয়া যে সকল ব্যবস্থা করিতেন, অনুকূল সে সকলে কর্ণপাত করিত না, তাহার মন তখন উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদের চিন্তাতেই মগ্ন থাকিত। কিন্তু দ্বারের অন্তরাল হইতে সাবিত্রী প্রতি তুচ্ছ কথা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিত। দুই তিন দিন অন্তর সাবিত্রীর অনেক সাধ্য সাধনার ফলে যখন অনুকূল তাহার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিয়া ডাক্তারের কাছে যাইতে স্বীকার পাইত, তখন সাবিত্রী একখণ্ড কাগজের উপর বিনোদিনীর পীড়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গুলি সবিস্তারে লিখিয়া দিত। বিনোদিনীর পীড়া যখন অত্যন্ত বাড়িয়াছিল, তখন সমস্ত দিন রাত্রি বিনোদিনী বিছানায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিতেন, সাবিত্রী গরম-জলের বোতল করিয়া শাশুড়ীর পেটে তাপ দিত, সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে শয্যায় বসিয়া কাটাইয়া দিত; ক্লান্তি বোধ করিত না। বিনোদিনীর কঠিন হৃদয় শোক ও পীড়ার যাতনায় কোমল হইয়াছিল, তাহার পর অভাগিনী সাবিত্রীর এই প্রাণপণ যত্ন; তাই বিনোদিনী সাবিত্রীকে কখনও রূঢ় কথা বলিতেন না।

সুনীতি ও মৃন্ময়ীকে দেখিয়াই তাহাদের প্রতি অসীম স্নেহে সাবিত্রীর হৃদয় ভরিয়া গেল। এই নবীন দম্পতীর সুখময় প্রেম পূর্ণ জীবন তাহার চক্ষে একটী স্বর্গীয় দৃশ্য বলিয়া বোধ হইল। যাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়, তাহাদের সুখ বোধ হয় নিজের সুখ অপেক্ষা বেশী ভাল লাগে। তাই সাবিত্রী তাহাদের শুইবার জন্য নিজের শয়ন ঘরটি নির্ব্বাচিত করিয়াছিল এবং স্বহস্তে সকল উপকরণ সুসজ্জিত করিয়াছিল। উহারা উভয়ে শুইতে গেলে সাবিত্রী তাহার শাশুড়ীর তত্ত্বাবধান করিল। তিনি পথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইবার ঘুমাইবেন। তিনি সাবিত্রীকে বলিলেন, "আমার আর কিছু দরকার নাই মা। আমি এখন ঘুমাইব। তুমি এবারে খাওয়া দাওয়া করে নাও।" সাবিত্রী দাসীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া নিজে আহার সমাধা করিল। তাহার পর বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল। সারাদিন পরিশ্রমের পর, এই তাহার বিশ্রাম।

সাবিত্রী যখন শ্বশুর ঘর করিতে আসিয়াছিল তখন তাহার মা তাহার সঙ্গে একটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ দিয়াছিলেন। তাঁহারা পল্লীগ্রামে থাকেন, সেখানে বহির দোকান নাই। দেবরকে সহরে পাঠাইয়া তিনি অনেক কষ্টে বইখানি আনাইয়া ছিলেন। বইখানি সাবিত্রীর বড় আদরের জিনিষ ছিল, কারণ ইহা তাহার দুঃখ পূর্ণ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল এবং ইহার সহিত তাহার পরলোকগত জননীর পুণ্যময় স্মৃতি বিজড়িত ছিল। অনেক দিন তাহার পড়িবার সময় হয় নাই, শাশুড়ীর অসুখের সময় সংসারের কাজই করিয়া উঠিতে পারিত না, কোনও কোনও দিন সমস্ত দিনে মুখে জলও দেওয়া হইত না। আজ একটু অবসর হইয়াছে। তোরঙ্গের মধ্য হইতে সাবিত্রী বইখানি বাহির করিয়া আনিল। বই-খানির উপরে মার্ব্বেল কাগজের মলাট স্থানে স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

পাতাগুলি ময়লা হইয়াছিল। অনুকূল একদিন রাগ করিয়া কয়েকটা পাতা ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, কাঁদিয়া কাটিয়া সাবিত্রী তাহার ক্রুদ্ধ স্বামীর হাত হইতে বইখানি কোনও ক্রমে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার পর বহু যত্নে ছিন্ন স্থান গুলি আঠা দিয়া জুড়িয়া রাখিয়াছিল। সেই পুরাতন ছিন্ন বইখানি লইয়া সাবিত্রী মাদুরের উপর শয়ন করিল।

বইখানি বুকের উপর রাখিতেই সাবিত্রীর মনে তাহার মায়ের কথা জাগিয়া উঠিল। উপর্য্যুপরি চারিটি ছেলে হইবার পর সাবিত্রীর জন্ম হয়, তাই সে মায়ের বড় আদরের মেয়ে ছিল। তাহার স্বর্গীয়া জননীর কোমল ও স্নেহময় হৃদয় হইতে অজস্রধারায় যে স্নেহ প্রবাহিত হইত, তাহা স্মরণ করিয়া সাবিত্রীর হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। হায় আজ তাহার মা কোথায়? সাবিত্রীর সন্দেহ ছিল না যে তাহার মা আজ পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়া, কিন্তু স্বর্গে থাকিয়াও সাবিত্রীর দুঃখের কথা ভাবিয়া নিশ্চয়ই তিনি দিন রাত্রি কাঁদিতেছেন, পৃথিবীতে থাকিতে যেমন কাঁদিতেন সেই রকম। বড় আশা করিয়া তিনি আদরিণী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহারা পল্লীবাসী দরিদ্র লোক ছিলেন, সাবিত্রী সহরে বড় ঘরে পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার মাতৃ-হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়াছিল। প্রথম প্রথম অনুকূলও সাবিত্রীকে আদর করিত। তখন আর তাঁহার সুখের সীমা ছিল না। সাবিত্রী যখন শ্বশুর ঘর করিতে গেল, তাহার কিছু দিন পরে তিনি একদিন লোক মুখে অনুকূলের দুশ্চরিত্র এবং সাবিত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা শুনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেকে সংবাদ লইতে পাঠাইলেন। ছেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যাহা শুনা গিয়াছিল তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সাবিত্রীর মাতার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি আহার নিদ্রা বন্ধ করিলেন। লোকের পর লোক পাঠাইয়া অনেক কষ্টে মেয়েকে আনিলেন। হায়

মেয়ের সোণার রূপ কালি হইয়া গিয়াছে। সাবিত্রীর বাপ মা ভাইরা সকলে প্রাণপণে তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সাবিত্রী বেশী দিন পিত্রালয়ে রহিল না। শ্বশুরঘরে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া বায়না ধরিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে শ্বশুরঘরে পাঠান হইল। সেখানে আসিয়া সাবিত্রী সংবাদ পাইল যে তাহার মাতার পীড়া হইয়াছে। যখন শুনিল যে তাঁহার অবস্থা বড় খারাপ তখন দেখিতে গেল, কিন্তু গিয়া আর তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। সাবিত্রী বুঝিল তাহার জন্যই কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মাতার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। বাড়ীতে সকলে নিদ্রিত। রামায়ণ খানি বুকের উপর রাখিয়া একা বারাণ্ডায় শুইয়া শুইয়া সাবিত্রী এই সকল কথা ভাবিতেছিল। দুই জীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া তাহার হৃদয়ের ভার লঘু হইল। একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বইখানি খুলিল। প্রদীপ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তাহা শিয়রের নিকট আনিয়া একটু উজ্জ্বল করিয়া দিল। তাহার পর পড়িতে লাগিল।

অশোক বনে সীতা বসিয়া আছেন। চারিদিকে চেড়ীগণ তর্জ্জন করিতেছে। রাবণ আসিয়া অনেক ভয় দেখাইতেছে। সীতা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। হায় আজ সেই নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম জগতে অদ্বিতীয় বীর শ্রীরামচন্দ্র কোথায়? তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি রাক্ষসেরা এই সকল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তিনি জানিতেছেন না। তিনি জানেনই না সীতা কোথায়। জানিলেও এই সমুদ্র-বেষ্টিত, পরিখা ও দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত, অগণিত সেনাযুক্ত রাক্ষসপুরীতে তিনি কি করিয়া আসিবেন? আর কি জীবনে স্বামীর সেই প্রিয়-দর্শন আকৃতি

দেখিতে পাইবেন ? জনক-নন্দিনীর এই দুঃখ কাহিনী পড়িতে পড়িতে সাবিত্রী নিজের দুঃখ ভুলিল।

তাহার পর নির্ব্বাসন কাহিনী পড়িল। নগরবাসিগণ নিন্দা করিয়াছে, তাই প্রজারঞ্জক শ্রীরামচন্দ্র সীতা দেবীকে ত্যাগ করিলেন। বিদায় দিবার সময় একবার দেখাও দিলেন না। দুষ্ট লোকের অপবাদে নিরপরাধিনীকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। ইহা কি সেই ন্যায়ের অবতার করুণ-হৃদয় মহাপুরুষের উচিত হইল? কিন্তু পরক্ষণেই সীতা আপনাকে সংশোধন করিয়া লইলেন। মনে মনেও তাঁহার স্বামীকে দোষ দেওয়া হইতেছে, ইহা খুব অন্যায়। সীতা দেবী ভাবিতেছেন যে তাঁহার এই দুঃখ জন্মান্তরীণ পাপের ফল, তাহার জন্য স্বামীকে দায়ী করা উচিত নহে বাল্মীকির তপোবনে আসিয়া সীতা দেবী দীন হৃদয়ে ও মলিন বসনে স্বামীর চিন্তায় দিবস যাপন করিতে লাগিলেন।

আর সাবিত্রীর নিজের অদৃষ্ট? সাবিত্রী কখনও স্বামীর আদর পাইল না। তাহার জীবনের এমন কোনও অংশ নাই, যাহার মধুর চিত্র স্মরণ করিয়া সাবিত্রী সুখী হইতে পারে। তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই-ই শ্যামল তরুলতা বর্জ্জিত মরুপ্রান্তরের ন্যায় শুষ্ক ও কষ্টদায়ক। তাহার উপর, সকলের চেয়ে বেশী কষ্ট, লোকে তাহার স্বামীর নিন্দা করে। এমন অনেক নির্ব্বোধ প্রতিবাসিনী আসেন, যাঁহারা সাবিত্রীর নিকট তাহার স্বামীর নিন্দা করাই সমবেদনা দেখাইবার উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। এই প্রকার সহানুভূতি প্রথম প্রথম সাবিত্রীর অসহ্য বোধ হইত। এখন সহিয়া গিয়াছে। সময়ে সকলই সহিয়া যায়।

বাহিরে জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। তরুলতা বিজন প্রান্তর ও নিস্তব্ধ লোকালয় গুলি সে জ্যোৎস্না মাখিয়া উৎসবের বেশে সাজিয়াছিল। জানালার মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক ও দক্ষিণ সমীর

ঘরে প্রবেশ করিয়া বাহিরের এই উৎসবের সংবাদ বহন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সাবিত্রীর হৃদয়ে এ সংবাদ পৌঁছিল না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর প্রায় অতীত হইয়াছে। বাহিরে দরজায় ধাক্কা পড়িল। সাবিত্রী বুঝিল, তাহার স্বামী ফিরিলেন। দরজার পাশে ঝি শুইয়াছিল, সে দরজা খুলিয়া দিল। টলিতে টলিতে অনুকূল প্রবেশ করিল। সে নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিল, সাবিত্রী বলিল, "ওদিকে যাইও না"। অনুকূল ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, অর্দ্ধনিমীলিত, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন যাইব না?"

সা। "ওঘরে তোমার ছোট ভাই ও ভাজ শুইয়াছেন।

অ। আমার ভাই?

সা। জ্যাঠা ম'শায়ের ছেলে, যিনি ছেলে বেলায় এখানে থাকিতেন।

অনুকূল চেষ্টা করিয়া মন স্থির করিল। বলিল "কে? সুনীতি?"

সা। হ্যাঁ।

অনুকূল ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "কে তাহাকে আমার ঘরে শুইতে দিল? আরও ত ঘর রহিয়াছে। আমার ঘরে না শুইলেই নয়?"

সাবিত্রী বলিল, "আমারই দোষ। আমি ঐ ঘর ভাল বলিয়া সেখানে উহাদের বিছানা করিয়া দিয়াছি।"

অনুকূল বলিল, "আমি উহাদিগকে তুলিয়া দিব। উহারা গোয়ালের পাশের ঘরে গিয়া শো'ক্। আমার ঘর দখল করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া সে নির্দ্দিষ্ট ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া ক্রুদ্ধ স্বামীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল, বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, এত রাত্রে আর এমন কেলেঙ্কারী করিও না। আমি

তা হ'লে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিব না। ভোর হইতে আর বেশী দেরী নাই। পাশের ঘরে বিছানা করিয়া রাখিয়াছি, শুইবে চল।"

সাবিত্রীর ব্যাকুলতা দেখিয়া অনুকূলের মন একটু কোমল হইল। সে সাবিত্রীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা আজ তোমার কথা রাখিব।"

সাবিত্রী নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। সে স্বামীকে নির্দ্দিষ্ট ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইল। অনুকূল তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। অল্পকাল মধ্যে সাবিত্রীও নিদ্রাভিভূত হইল। তখন শুক্লপক্ষের চন্দ্র পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতেছিল। মনে হইতেছিল প্রকৃতি এতক্ষণ নীরব উৎসবে ব্যাপৃত ছিল। এইবার ঘুমাইয়া পড়িতেছে।

উষালোকপ্রবোধিত পক্ষীর প্রথম কলরব ধ্বনিত হইবার পূর্ব্বেই সাবিত্রী নিদ্রা হইতে উঠিল। ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া হাত মুখ ধুইয়া স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া সাবিত্রী পূজার ঘরে প্রবেশ করিল। পূজা সমাপ্ত করিয়া যখন বাহির হইল তখন ঝি বাসন মাজিতেছিল, আর কেহই উঠে নাই। সাবিত্রী তরকারির ঝুড়ি লইয়া তরকারি কুটিতে বসিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অসংসঙ্গ

মৃন্ময়ীর শরীর পথশ্রমে কাতর ছিল। কোমল শয্যা এবং হৃদয়-স্নিগ্ধকারী দক্ষিণ সমীরণের প্রভাবে সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল বেলা হইয়াছে। একটু লজ্জিত হইয়া সে বাহিরে আসিল। সাবিত্রী তরকারি কুটিতেছিল। সে মধুর হাস্যে মৃন্ময়ীকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের ভাল বিছানা নাই, তোমাদের ঘুমাইবার অসুবিধা হয় নাই ত?"

মৃন্ময়ী বলিল, "না দিদি, দেখিতেছ না কত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিলাম?"

উভয়ে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। একটু পরে অনুকূলের মা উঠিলেন। সাবিত্রী তাঁহার নিকটে গেল। তাঁহার কাজ হইয়া গেলে সাবিত্রী রান্না ঘরে গেল। মৃন্ময়ীও নিকটে গিয়া তাহার সাহায্য ও গল্প করিতে লাগিল।

সুনীতি সকালে খুড়ীমার ঘরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ীমা, কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন, "ভাল আছি বাবা। অনেকদিন পরে কাল বেশ ঘুম হয়েছিল। তুমি হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে এস। ও বৌমা—সুনীতির খাবার জায়গা ক'রে দাও ত।"

সুনীতি খাবার জায়গা দেখিয়া বলিল, "অনুকূল দাদা কোথায়? তাহার সঙ্গে খাবার খাব।"

সাবিত্রী মৃন্ময়ীকে বলিল, "তাঁহার এখন অনেক দেরী আছে। তুমি ওঁকে খাবার খেতে বল।"

অতঃপর খুড়ীমা ও সাবিত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া সুনীতি খাবার খাইল। খাবার খাইয়া নদীতীরে গেল। নৌকাতে যে সকল জিনিষ ছিল তাহা গাড়ীতে তুলিয়া নৌকা বিদায় করিয়া দিল। সুনীতির সঙ্গে কলিকাতা হইতে যে লোক আসিয়াছিল তাহাদিগকে রেলে করিয়া কলিকাতা পাঠাইয়া দিল। এই সব বন্দোবস্ত করিয়া সুনীতি কাকার বাসায় ফিরিয়া আসিল। অনুকূল সেই মাত্র ঘুম হইতে উঠিতেছে। সুদীর্ঘ নিদ্রার পর তাহার নেশা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। তাই সুনীতি যখন নিকটে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, তখন অনুকূল সুপ্রসন্ন মুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। অনুকূলের কিরূপ মেজাজ থাকিবে তাহা ভাবিয়া সাবিত্রীর হৃদয় শঙ্কিত হইয়াছিল। সুনীতির সহিত প্রসন্নমুখে কথা বলিতে দেখিয়া সাবিত্রী নিশ্চিন্ত হইল।

সুনীতি বলিল, "অনুকূল দাদা, কাল রাত্রে তোমার বাড়ী ফিরিতে বড় দেরী হইয়াছিল, না? আমরা যখন শুইতে গেলাম, তুমি ত তখনও ফের নাই।"

অনুকূল ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ ভাই কাল একটা নেমন্তন্ন ছিল। তাই রাত হয়ে গেছ্‌ল।"

সুনীতি বলিল, "আজ ত আর নেমন্তন্ন নাই?"

অনুকূল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজও একটা—ছিল। তা, তুমি যখন এসেছ—আজ কি কর্‌ব ভেবে উঠ্‌তে পার্‌চি না।"

সুনীতি গম্ভীর ভাবে বলিল, "না অনুকূল দাদা, রোজ রোজ তোমার

নেমন্তন্ন খাওয়া চল্‌বে না। আমি যে ক'টাদিন আছি, তোমাকে সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গেই বাড়ী ফির্‌তে হবে। খুড়ীমার কাছে সবাই এক সঙ্গে বসে গল্প করা যাবে। কতদিন এক সঙ্গে গল্প করা হয় নাই বল দেখি?"

বাল্যকালের কথা মনে হইলে সকলেরই হৃদয় একটু কোমল হয়। সুনীতির কথা শুনিয়া এত যে দুর্বৃত্ত অনুকূল তাহার মনও বাল্যস্মৃতি প্রভাবে কিছু কোমল হইল। বুঝি তাহার মনে হইল, কই এই নিয়ত পাপাচরণ করিয়া মনের ত শান্তি পাওয়া যাইতেছে না। বাল্যকালে যখন হৃদয় এরূপ পাপে পূর্ণ হয় নাই, তখন বোধ হয় মনের শান্তি কিছু ছিল। আর মনে পড়িল তাহার পিতার ধীর শান্ত মূর্ত্তিখানি। এক মুহূর্ত্তের জন্য অনুকূলের চক্ষুঃপ্রান্তে কি যেন চক্ চক্ করিয়া উঠিল। অনুকূল বলিল, "আচ্ছা তাই হবে ভাই। আজ আর নেমন্তন্নে যাব না।"

বাস্তবিকই সুনীতি যে কয়দিন ছিল, অনুকূল শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিত। বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় সুনীতি অনুকূলের সঙ্গে যাইবে বলিয়া জিদ করিত। অগত্যা অনুকূল তাহার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুরূপ সকল স্থানে যাইতে পারিত না। তথাপি কোনও কোনও দিন অনুকূল সুনীতিকে একটু বসিতে বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইত, বলিত, "বিশেষ প্রয়োজন আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব।" আধ ঘণ্টা বলিয়া দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পরে ফিরিত। অনুকূলের জড়িত কণ্ঠস্বর এবং আরক্তিম চক্ষু দেখিয়া সুনীতির কিছু বুঝিতে বাকী থাকিত না। কোনও কোনও দিন পরিষ্কার মদের গন্ধ পাওয়া যাইত। কোনও দিন বা অনুকূলের কোনও বন্ধুর সঙ্গে তাহাদের পথে দেখা হইত। সুনীতি সঙ্গে আছে বলিয়া অনুকূল

ইঙ্গিতে তাহার বন্ধুদিগকে চুপ করিতে বলিত। কিন্তু অনুকূলের সঙ্কোচ উপেক্ষা করিয়া তাহারা কুৎসিত কথা বলিত। এই সকল সত্ত্বেও সুনীতির মনে ঘৃণা বা বিরক্তির উদয় হইল না। সুনীতি মনের ভিতর দেখিত যেন সাবিত্রীর বিষণ্ণ মুখখানি করুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। "আমার স্বামীকে কুসংসর্গ হইতে রক্ষা কর" এই অনুনয় যেন নীরব ভাষায় প্রকাশ হইতেছিল। তাহার স্বামীর জন্য এই সামান্য কষ্ট স্বীকার করাতেই যেন তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সুনীতি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত, অনুকূলকে সংশোধন করিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। সে ভাবিত হায় মানুষের সাধ্য কত কম ?

একদিন অনুকূল সুনীতির সহিত বেড়াইতে গিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল। সুনীতি বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিল। পশ্চিম গগনে কয়েকখণ্ড মেঘের পশ্চাতে সূর্য্যদেব তাঁহার রহস্যময় আবাসে প্রস্থান করিতেছিলেন। সদ্যঃপ্রাপ্ত আঘাত চিহ্নের ন্যায় সেই স্থানটি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। নীল আকাশের উপর বিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ড গুলি লাল সোণালি প্রভৃতি নানা বর্ণে শোভিত হইয়াছে। মেঘের প্রান্তগুলি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মূল্যবান কাপড়ের পাড়ের মত সুন্দর দেখাইতেছে। এক-স্থানে মেঘগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত—কে যেন সোণার ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়াছে। মেঘের অন্তরালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত সৌরকিরণরেখা সমস্ত আকাশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাকাশ প্রান্তে মিলিত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মেঘের বর্ণগুলি ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল। আকাশের নীলিমা ক্রমে মলিন ধূসরে পরিণত হইল। দূরের বৃক্ষরাজির উপর অন্ধকার নামিয়া আসিল, সেই

অন্ধকারের মধ্যে যেন দুঃখ ও বিষাদ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরগুলি কি এক শূন্যতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আকাশময় একে একে নক্ষত্র গুলি ফুটিয়া উঠিল—কে যেন আকাশময় হীরকচূর্ণ ছড়াইয়া দিল। সম্মুখে বৃক্ষরাজির মধ্যে দুই একটী আলোক লোকালয় নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। পশ্চাতে নগরের আলোকমালা শোভা পাইতে লাগিল।

রাত্রি হইল, তথাপি অনুকূল ফিরিল না। অতঃপর সুনীতি দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরিল।

সুনীতি গৃহে প্রবেশ করিল। সাবিত্রী তখন রন্ধনগৃহে। জুতার শব্দ পাইয়া সে ফিরিয়া চাহিল। সুনীতি দেখিল, তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া সাবিত্রীর মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইল, যেন জ্যোৎস্না প্রফুল্ল প্রকৃতির উপরে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ আসিয়া সমস্ত চন্দ্রালোক বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সকলের আহার শেষ হইল। তথাপি অনুকূল ফিরিল না। অনুকূল কখন ফিরিয়া আসে তাহা জানিবার জন্য সুনীতি অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল তথাপি অনুকূল আসিল না। তাহার পর সুনীতি ঘুমাইয়া পড়িল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পরিত্রাণ

কয়দিন ধরিয়া অনুকূলকে তাহার মা বলিতেছিল, "যা না, মতিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে আয়, সুনীতি দেখিতে চাহিতেছে।" অনুকূল আজ নয় কাল এই ভাবে দেরী করিতেছিল। অবশেষে একদিন যাইতে প্রস্তুত হইল। সুনীতি বাজার হইতে ভাল মিষ্টান্নাদি কিনিয়া আনিল। অনুকূল বাবু সাজিয়া ভগ্নীর শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

অপরাহ্ণে সুনীতি খুড়ীমার ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল এমন সময় মেয়ে কোলে করিয়া একটী যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল এবং অনুকূলের মায়ের ও সুনীতির পায়ের ধূলা লইয়া একটু হাসিয়া সুনীতির দিকে চাহিয়া বলিল, "এত দিন পরে সুনীতি দাদার আমাদিগকে মনে পড়েচে।"

সুনীতি বলিল, "খুকী যে মস্ত বড় হয়ে গেছিস্। তোর মেয়ে কতদিনের হইল? কি নাম রেখেছিস্?"

মতিমালা বলিল, "আমার মেয়ের বয়স দেড় বছর হইল। ওর নাম মৃণালিনী।"

সুনীতি হাত বাড়াইয়া বলিল, "এস গো মৃণালিনী, আমার কোলে এস।"

মেয়ে মায়ের পিঠে মুখ লুকাইল। মতিমালা তাহাকে বলিল,

"যা না। মামার কাছে যাবি না?" কিন্তু মেয়ে কিছুতেই আসে না। সুনীতি তাহাকে জোর করিয়া কোলে লইতেই সে কাঁদিয়া উঠিল। অগত্যা সুনীতি তাহাকে ফিরাইয়া দিল।

বিনোদিনী মেয়েকে তাহার শ্বশুর বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মতিমালা বলিল, "যাই বউদিদির সঙ্গে ভাব করি গে। আমরা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। বউদিদি কি আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে?"

মতির মা বলিল, "বৌমা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। তোর কথা, তোর শ্বশুর বাড়ীর কথা প্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করে। তোকে দেখ্‌লে নিশ্চয় খুব খুসী হবে।"

মতি উঠিয়া গেল। "অনুকূল দাদা কোথায় দেখি" বলিয়া সুনীতিও বাহিরে গেল।

একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে অনুকূল সুনীতিকে বলিল "তুমি বোস। আমি এখনই আসিব।" সুনীতির কিছু দিনের আগের ঘটনা মনে পড়িল। সে অনুকূলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল আর অনুকূলকে ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিবে না। অনুকূল চলিয়া গেলে সুনীতি কিছু দূরে থাকিয়া অনুকূলের অনুসরণ করিল। অনুকূল দ্রুতপদে চলিতেছিল, যেন তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। সুনীতিকে ও দ্রুতপদে চলিতে হইল।

অনুকূল নগরে প্রবেশ করিল। নগরের মধ্যে বাজার। পথ সঙ্কীর্ণ। দুই পাশে মনোহারি দোকান কাপড়ের দোকান খাবারের দোকান। কেনা বেচা চলিতেছে। পথে লোকের ভিড়। দূরে থাকিলে অনুকূলকে লক্ষ্য করিয়া রাখা কঠিন হইবে, তাই সুনীতি খুব কাছে কাছে যাইতে-

ছিল। একটা দোকানের ধার দিয়া একটা অন্ধকার গলি, তাহাতে যে বিশেষ লোকচলাচল হয় তাহা মনে হইল না। অনুকূল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। অগত্যা সুনীতিকেও যাইতে হইল। গলির দুই পাশে নর্দ্দমা, অতিশয় দুর্গন্ধ। খুব অন্ধকার বলিয়া সুনীতি ভরসা করিয়া চলিল, নহিলে সে অনুকূলের এত কাছে আসিয়াছে যে তাহার সজোর নিঃশ্বাসও শুনিতে পাইতেছিল। একটু যাইয়া অনুকূল থামিল। পার্শ্বের দরজায় করাঘাত করিল। শব্দ শুনিয়া সুনীতি বুঝিল করাঘাত সঙ্কেত পূর্ণ। তিনবার সেই প্রকারের করাঘাত করিবার পর দরজা উন্মুক্ত হইল, তখন অনুকূল ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে যাইবে কি না এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সুনীতি গলি দিয়া ফিরিতেছিল এমন সময় একজন লোক দ্রুতপদে তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া গলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। লোকটি একটি আলোর নীচে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইল। তখন তিন চারটি লোক তাহার নিকট উপস্থিত হইল। কৌতূহল বশতঃ সুনীতি ঐ লোকের নিকটে যাইতেছিল। সুনীতি যখন তাহাদের ধার দিয়া চলিয়া যাইতেছে এমন সময় শুনিল যে সঙ্কেতকারী লোক অনুচরদিগকে বলিতেছে, "জুয়ার আড্ডার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রামসিং, তুমি থানা হইতে ১২ জন কনষ্টেবল আন আমরা এখানে পাহারা দিতেছি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।" সুনীতি বুঝিল যে ইহারা পুলিশের কর্ম্মচারী, আড্ডার লোকদিগকে ধরা ইহাদের উদ্দেশ্য। অনুকূলকে এই সময়ে আড্ডা হইতে বাহিরে আনিতে না পারিলে তাহাকেও হয় ত ধরা পড়িতে হইবে। সুনীতি আড্ডা ঘরে ফিরিয়া গেল এবং পূর্ব্বশ্রুতি অনুসারে দ্বারের উপর সঙ্কেত পূর্ণ করাঘাত করিল। একটু পরে দরজা খোলা হইল। সুনীতি ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন দারোয়ান দরজা খুলিয়াছিল, সে যাহাতে সুনীতিকে

ভাল করিয়া দেখিতে না পায় এই জন্য সুনীতি মুখ ফিরাইয়া শীঘ্র তাহাকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। সিঁড়ির ধারে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া সুনীতি উপরে উঠিল। অদূরে একটি কক্ষ হইতে আলো এবং কোলাহলের শব্দ আসিতেছিল। সুনীতি সাহস করিয়া সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কয়েকজোড়া তাস লইয়া খেলা চলিতেছিল। চারিদিকে কতকগুলি টাকা ছড়ান ছিল। যাহারা খেলিতেছিল না, তাহারা অদূরে বসিয়া মদ খাইতেছিল, খেলা দেখিতেছিল এবং মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করিয়া খেলোয়াড়দের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছিল। অনুকূল এই দলের মধ্যে বসিয়াছিল। সুনীতি যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, অনুকূল প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। অপর একব্যক্তি সুনীতির অপরিচিত মূর্ত্তি দেখিয়া মাদকতার ঘোরে জড়িতস্বরে বলিয়া উঠিল,

"তুমি কোন্ গগনের চাঁদ?"

আর একজন সেই সুর ধরিয়াই বলিল, "তুমি কোন আকাশের তারা?"

এই কবিত্ব পূর্ণ প্রশ্নের প্রবাহে বাধা দিয়া সুনীতি ডাকিল, "অনুকূল দাদা"। ইতিপূর্ব্বেই অনুকূল সুনীতির দিকে তাকাইয়া ছিল, কিন্তু ঠিক করিতে পারে নাই যে এ সুনীতি না অপর কেহ। সুনীতির কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার এ সন্দেহ ঘুচাইয়া দিল। অতিরিক্ত বিস্ময় ও কিয়ৎপরিমাণে লজ্জায় অভিভূত হইয়া সে উঠিয়া সুনীতির নিকট আসিল। সুনীতি ফিরিয়া চলিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে অনুকূল সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?" সুনীতি বলিল, "সে কথা পরে হইবে। এখন চুপ করিয়া আমার সঙ্গে আইস। সম্মুখে বড় বিপদ।" তাহারা দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইলে পর

দারোয়ান পুনরায় দরজা বন্ধ করিল। গলি ছাড়িয়া তাহারা যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল তখন সুনীতি দেখিল তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট পুলিশ কর্ম্মচারী কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া গলিতে প্রবেশ করিল। পুলিশের লোক দেখিয়া অনুকূল চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারা এদিকে যাইতেছে কেন?" সুনীতি অনুকূলের হাত চাপিয়া ধরিল। অধিক রাত্রে উভয়ে বাড়ী ফিরিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সৎসঙ্গ

পরদিন সহরে খুব আন্দোলন হইতে লাগিল—একটা বড় বদমায়িসদের দল ধরা পড়িয়াছে। দলের মধ্যে অনেকেই খুন ডাকাতি প্রভৃতি অভিযোগের আসামী। কিছুদিন হইতে সহরে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামে কয়েকটা ডাকাতি ও খুন হওয়ায় সাধারণের মনে আতঙ্ক হইয়াছিল। পুলিশ প্রমাণ পাইয়াছিল যে প্রায় সবগুলির জন্যই এই দলটি দায়ী। এক্ষণে সাধারণে নিরুদ্বিগ্ন মনে কালযাপন করিতে পারিবে। কয়েকটি ভদ্রলোকের বাড়ীর যুবক এই দলের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। তাহারা দুশ্চরিত্র বলিয়া সকলে জানিত। কিন্তু তাহারা যে ডাকাতি করিত ইহা কেহই সন্দেহ করিত না।

বিনোদিনীর ভালরূপ চিকিৎসা করাইবার জন্য সুনীতি তাঁহাকে

কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। বিনোদিনী ইহাতে সম্মত হইলে, সুনীতি ও বিনোদিনী উভয়েই অনুকূলকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। অনুকূলের প্রথমে ইচ্ছা ছিল না। কারণ যে সমস্ত আমোদ সে ভালবাসিত, সুনীতির নিকট থাকিলে সে সকল আমোদে যোগদান করিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু এখানে তাহার দলের প্রায় সকল সঙ্গিগণ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছে, কতকটা ইহা ভাবিয়া, কতকটা সুনীতি ও বিনোদিনীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনুকূল অবশেষে সম্মত হইল। মতিমালা ইতিপূর্ব্বেই শ্বশুর বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল। জিনিষপত্র বাঁধিয়া, ঘর দোর বন্ধ করিয়া একদিন সকলে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। যথাসময়ে তাহারা কলিকাতায় পৌছিল। বিনোদিনীর অসুখ অল্পদিনের মধ্যেই অনেকটা সারিয়া উঠিল। তিনি যথেষ্ট আগ্রহের সহিত যাদুঘর, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি কলিকাতার যাবতীয় দ্রষ্টব্য পদার্থ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুনীতি অনেক সময়ই তাহার লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিত। সুতরাং সাবিত্রীর সঙ্গ লাভ করিয়া মৃন্ময়ীর আনন্দের সীমা রহিল না। গৃহকর্ম্ম এবং অবসরের সময় উভয়ে নানা প্রকার গল্প এবং হাস্য পরিহাস করিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে দিন যাপন করিতে লাগিল। উভয়েরই হৃদয় আনন্দ পূর্ণ—মৃন্ময়ীর আনন্দ স্রোতস্বিনীর জলধারার ন্যায় চঞ্চল ও কলহাস্য-মুখরিত ; সাবিত্রীর আনন্দ, নিস্তব্ধ নিশীথের কৌমুদী প্লাবনের ন্যায় স্থির, নীরব এবং সর্ব্বত্র সুপ্রসারিত।

অনুকূলের প্রথমে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। সুনীতি প্রথম হইতেই অনুকূলকে ইচ্ছামত যথা তথা যাইতে দিত না। কিন্তু এরূপ কৌশলের সহিত অনুকূলের গতিবিধি সংযত করিয়া রাখিত যে অনুকূল রাগ করিতে পারিত না। মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া থাকিত। সুনীতির

সরল অকপট ব্যবহারে তাহার উপর বিরক্ত হওয়া কাহারও সম্ভব ছিল না—অনুকূলেরও নয়। অনুকূলের উৎসাহ সুপথে চালিত করিবার জন্য সুনীতি তাহাকে একটি অনাথ ভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিল।

কথনও কখনও মানুষের জীবনে হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন হয় যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনুকূলের তাহাই হইল। কিছুদিনের মধ্যে অনুকূল অনাথ-ভাণ্ডারের সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহবান্ সভ্য হইয়া পড়িল। তাহার চেষ্টা ও উদ্যোগে ভাণ্ডারের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে লাগিল। কোনও বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে যখন কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী কোনও তীর্থস্থানে অতিরিক্ত জনসমাগম বশতঃ তীর্থযাত্রিগণের পীড়া এবং অন্যান্য অসুবিধার সম্ভাবনা হইত সে সময় অনুকূলের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক যুবক কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করিত।

অনুকূলের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে সকলেই সুখী হইয়াছিল, এবং এই প্রসঙ্গ তুলিয়া বিনোদিনী প্রায়ই সুনীতির নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিত। কিন্তু যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও কৃতজ্ঞ হইয়াছিল, সে কখনও মুখে একবারও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত না। তাহার সুখ ও কৃতজ্ঞতা মানববোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে ভাষা একা অন্তর্য্যামীই বুঝিতে পারেন, সেই ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করা যায়। বলিতে হইবে না, সে সাবিত্রী।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

কারাগৃহ
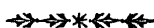
শীতকাল। ছয়টা বাজিয়াছে। এখনও অন্ধকার। ভয়ানক শীত। বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে না। জেলের কয়েদীগণ কম্বল জড়াইয়া ঘুমাইতেছে। অস্পষ্ট আলোকে কম্বলাবৃত কারাবাসিগণের সারি সারি ভূমিবিলম্বিত দেহ দেখিলে মনে হয় এ কোন প্রেতভূমি। নিদ্রিত কারাবাসীদের নিঃশ্বাসের শব্দ ব্যতীত আর কোনও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। এমন সময় সজোরে জেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ইহা নিদ্রা হইতে উঠিবার ঘণ্টা। ঘণ্টাধ্বনিতে অনেকেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা উঠিয়া বসিল। কেহ কেহ পাশের যাহাদের ঘুম ভাঙ্গে নাই তাহাদিগকে উঠাইয়া দিল। কয়েদীগণ উঠিয়া একে একে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দুই চারিজন তখনও শুইয়াছিল, একটু পরে ওয়ার্ডার আসিয়া লাঠি দিয়া নাড়িয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া দিল। নিষ্ফল ক্রোধ-ব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কয়েদীদের নাম ডাকিয়া হাজিরি লওয়া হইল। তখন তাহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আরম্ভ করিল।

বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় জেলের আফিস ঘর হইতে একজন ওয়ার্ডার ঘানিঘরে গিয়া ডাকিল "১৩৭ নম্বর কয়েদী—বাবুরাম পাল" একজন কৃষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ-দেহ লোক কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হইয়া ওয়ার্ডারের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির মধ্যে আশা বা আশঙ্কার কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল না। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত কলের মানুষ যেমন করিয়া চাহিবে,

লোকটা সেইভাবেই চাহিল। ওয়ার্ডার তাহাকে নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিল। নির্দ্দিষ্ট কয়েদী নিকটে আসিলে পর ওয়ার্ডার বিনা বাক্য-ব্যয়ে আফিস অভিমুখে চলিল। সেখানে যে কেরাণী বসিয়াছিলেন, তিনি নাম পড়িলেন, "বাবুরাম পাল"। ওয়ার্ডার কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম বাবুরাম পাল?" কয়েদী সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিল। তখন তাহার গলদেশ হইতে বিলম্বিত কাষ্ঠফলকের নম্বরের সহিত খাতার নম্বর মিলান হইল। কেরাণী পড়িলেন "পিঠে দুইটি তিল আছে, বাম চক্ষুর উপরে কাটা দাগ।" পিঠের জামা তুলিয়া চিহ্ন দেখা হইল। অন্যান্য চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল। তখন বাবুরাম শুনিল যে কাল সে কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইবে। এই সংবাদ শুনিয়া বাবুরামের চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই। পর-ক্ষণেই তাহার সহজ কঠোর ভাব মুখের উপর ফিরিয়া আসিল। সে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে জেলে আসিয়াছিল। অনুকূল যে দলে ছিল সেই দল ধরা পড়িবার কথা পাঠক পূর্ব্বে শুনিয়াছেন। বাবুরাম ঐ দলের দলপতি ছিল। তাহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ডাকাতির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বাবুরাম ৫ বৎসরের কারাবাসে দণ্ডিত হয়। জেলে আসিয়া প্রথম প্রথম সে দিন গণিত। এক মাস দুই মাস করিয়া সাত আট মাস কাটিয়া গেল। বাবুরাম দেখিল দিনগুলি অতি বিলম্বে অতিবাহিত হইতেছে। ৫ বৎসর পূর্ণ হইতে অনেক দেরী। তখন সে দিন গণা ছাড়িয়া দিল। সে ভাবিল "আমার দিন গণিবার জন্য ত মাহিনা দিয়া চাকর রাখা হইয়াছে। সে দিন গণুক। আমি কেন কষ্ট করিয়া দিন গণিতে যাই।" তাই এই মুক্তির অপ্রত্যাশিত সংবাদে সে প্রথমে বিচলিত হইয়াছিল।

সমস্তদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে আহারের পর বাবুরাম শুইয়া শুইয়া ভাবিত, সে কি করিয়া ধরা পড়িল। সে অন্যায় কর্ম্ম করিত, এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিতেছে—এ ভাব কখনও তাহার মনে আসিত না। সে ভাবিত ধরা পড়াটাই তাহার অন্যায় হইয়াছে। এ অন্যায়ের জন্য নিশ্চয়ই কেহ দায়ী। কারাবাস শেষ হইলে তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে হইবে।

যে রাত্রে তাহারা ধরা পড়িয়াছিল সেই রাত্রের ঘটনা সে বার বার মনের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে ধরা পড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই একজন অপরিচিত লোক আসিয়া অনুকূলকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। বাবুরাম সিদ্ধান্ত করিল সেই অপরিচিত লোকই নিশ্চয় পুলিশকে সন্ধান দিয়াছিল। কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া বাবুরামের প্রথম কার্য্য হইবে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান করা।

ওয়ার্ডার বাবুরামকে সঙ্গে করিয়া ঘানিঘরে লইয়া চলিল। যাইবার পূর্ব্বে বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে মুক্তি পাইয়া কোথায় যাইবে। সে বলিল কাটোয়া যাইবে।

আফিস ঘর হইতে ফিরিয়া গিয়া বাবুরাম তাহার দৈনিক পরিশ্রম আরম্ভ করিল। আজিকার দিন কাটাইতে পারিলেই সে মুক্ত হইবে। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। রাত্রি এগারটা, বারটা, একটা, দুইটা, তিনটা সব ঘণ্টাগুলি সে জাগিয়া শুনিল। অবশেষে ভোরের সুপ্তোত্থিত বিহগ-কুলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। আজ দরজা খুলিবার পূর্ব্বেই বাবুরাম উঠিয়া বসিয়াছিল।

সকালবেলা জেলার বাবু তাহার মুক্তির আদেশ স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। বাবুরামকে কাটোয়া পর্য্যন্ত রেলে যাইবার অনুমতি পত্র

দেওয়া হইল। কয়েদীর পোষাক ছাড়াইয়া তাহাকে থানের ধুতি ও গামছা দেওয়া হইল। এবং তাহার নামে যে টাকা জমা ছিল তাহাও দেওয়া হইল। তখন বাবুরাম জেলের বাহিরে আসিল। এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিয়া গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিল।

দেশে আসিয়াই সে অনুকূলের বাটীতে চলিল। দেখিল বাটীর দরজা বন্ধ, বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। অনুকূলের বিশেষ পরিচিত যাহারা ছিল তাহাদের নিকট সন্ধান লইয়া বাবুরাম জানিল যে অনুকূল তাহার জ্যেঠতুত ভাইয়ের সহিত কলিকাতায় গিয়াছে। এখন সেখানেই থাকিবে। বাবুরাম অনুমান করিল যে সে যাহার অনুসন্ধান করিতেছে সে বোধ হয় অনুকূলের জ্যেঠতুত ভাই। যাহাই হউক অগ্রে অনুকূলকে খুঁজিয়া বাহির করা যাউক এই ভাবিয়া সে অনুকূলের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন মা

কলিকাতার একটী প্রাসাদ-তুল্য গৃহের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে প্রভাতকালে একটী গৌরবর্ণের সুন্দর শিশু ঘুমাইতে ছিল। পূর্ব্বদিকের জানালার বিচিত্র পর্দ্দার মধ্য দিয়া কয়েকটি সৌররশ্মি শিশুর পদতলে পড়িয়া দুইটি রক্তপদ্মের সৃষ্টি করিয়াছে। বাটীর দক্ষিণে ফুলের বাগান। নবজাগ্রত দক্ষিণ পবন পুষ্পসৌরভ আহরণ করিয়া গৃহটি আমোদিত করিয়াছিল,

এবং কখনও শয্যার আস্তরণ, কখনও শিশুর ক্ষুদ্র ললাটের উপর রেশমের ন্যায় কেশগুচ্ছ আন্দোলিত করিতেছিল।

শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বালক 'মা' বলিয়া ডাকিল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে একটা যুবতী ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া "কে উঠেছে রে? আমার রাজা বাবু উঠেছে। ঘুম হ'ল বাবু? সোণা আমার, মাণিক আমার" এইভাবে তাহার উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল এবং আবেগভরে বার বার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। শিশুও মাতার খোঁপার চুল ধরিয়া টানিল, নাকের উপর জিব বুলাইল এবং এইরূপ অন্যান্য মৌলিক উপায়ে তাহার আহ্লাদ প্রকাশ করিল। কিছুক্ষণ আদর করিয়া মাতা শিশুকে লইয়া গিয়া হাত মুখ ধোয়াইলেন, তাহার পর তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া পোষাক পরাইতে বসিলেন। শিশুর চাঞ্চল্য প্রযুক্ত মধুর অঙ্গবিক্ষেপগুলি মাতার চক্ষে অতিশয় অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল। যেন স্বর্গের সমুদয় সৌন্দর্য্য এই শিশুর ক্ষুদ্র দেহে পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। শিশুর পোষাক পরানো হইলে মাতা তাহাকে কোলে করিয়া শয়নগৃহের দক্ষিণের জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন।

বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, দুই চারিটি পাখী পত্রান্তরালে বসিয়া হর্ষধ্বনি করিতেছে, পথে লোকজন চলিতেছে, গাড়ী ঘোড়া ছুটিতেছে, রৌদ্র ও ছায়ায় দৃশ্যাবলি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময়ী ছেলে কোলে করিয়া দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে মৃন্ময়ী লক্ষ্য করিল একটা কালো রংয়ের বলিষ্ঠ লোক রাস্তার অপর ধার হইতে তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। লোকটাকে দেখিয়াই মৃন্ময়ীর মন কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার চেহারা ও চাহনির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। মৃন্ময়ী তাহার দৃষ্টি হইতে সরিয়া আসিতেছে,

এমন সময় সাবিত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সাবিত্রীকে দেখিয়া মৃন্ময়ী বলিল, "দিদি দেখ একটা লোক কেমন ভাবে আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে আছে।" সাবিত্রী জানালার নিকটে আসিয়া চমকিয়া উঠিল। বাবুরামকে সে পূর্ব্বে দেখিয়াছিল। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ী বলিল, "দিদি ভয় পাইলে কেন? লোকটাকে তুমি চেন নাকি?"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ষড়্‌যন্ত্র

একদিন সন্ধ্যার সময় নারায়ণ সুনীতির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একজন লোক অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত তাহার পিঠে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি ভাই?"

নারায়ণ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। অন্ধকারে প্রশ্নকারীর মুখ ভাল করিয়া দেখা গেল না। কোনও রূপ সন্দেহের কারণ না দেখিয়া নারায়ণ সরল ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিল। লোকটা আরও অনেক প্রশ্ন করিল। নারায়ণ যথাযথ উত্তর দিল। লোকটা বলিল, "আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আমার মায়ের কঠিন পীড়া হইয়াছে। অর্থাভাবে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি সুনীতিবাবু অতি সদাশয় ব্যক্তি। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিতে যাইব ভাবিতেছি। তাই তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিছু মনে করিও না।"

এইরূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে লোকটা নারায়ণের বাড়ী পর্য্যন্ত চলিল। সেখানে রাত্রের মত তাহার নিকট বিদায় লইয়া বলিল, সে পরদিন আবার আসিয়া দেখা করিবে। নারায়ণ ভাবিল, "আহা ভদ্রলোক কি কষ্টেই পড়িয়াছে! আমার কি অন্যায় আমি হঠাৎ ইঁহাকে দেখিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে লোকটা বড় খারাপ।"

পরদিন বাবুরাম (কারণ সে অপরিচিত ব্যক্তি আর কেহই নয়) যথাসময়ে নারায়ণের নিকট আসিল। নারায়ণ বলিল "চলুন, আপনাকে সুনীতিবাবুর নিকট লইয়া যাই। তিনি নিশ্চয়ই আপনার বিপদের কথা শুনিয়া আপনাকে সাহায্য করিবেন।" বাবুরাম বলিল, "তাঁহার মত বড় মানুষের নিকট হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইতে ভয় পাই। আমরা মূর্খ এবং দরিদ্র। তুমি আজ তাঁহার নিকট আমার কথা বলিয়া রাখিও। তিনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে কাল বা অন্য সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব।"

নারায়ণ বলিল, "সুনীতিবাবুর নিয়ম আছে কাহারও অভাব বা বিপদের কথা শুনিলে তিনি নিজে দেখিতে যান। তাহার পর সাহায্য দেন। নিজে না দেখিয়া প্রায় সাহায্য দেন না।"

নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে বাবুরাম বলিল, "আমার তাহা হইলে সাহায্য পাইবার আশা খুব কম। কারণ আমার বাড়ী বহুদূর। লুপলাইনের বনপাশ ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ীতে ছয়ক্রোশ পথ। এতদূর কে কষ্ট করিয়া যাইবে?"

নারায়ণ বলিল, "না সে বিষয় আপনি ভাবিবেন না। তিনি পল্লীগ্রাম দেখিতে খুব ভাল বাসেন। আপনাদের গ্রামে গিয়া তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আসিবেন।"

"আচ্ছা তাহা হইলে কাল সকালে আসিব।" এই বলিয়া বাবুরাম সেদিন চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় বাবুরাম আসিয়া নারায়ণের দরজায় ধাক্কা দিল, নারায়ণ দরজা খুলিলে বাবুরাম বলিল, "এইমাত্র বাড়ী হইতে তার আসিয়াছে, মায়ের অসুখ খুব বাড়িয়াছে। আমাকে আজ রাত্রের গাড়ীতেই ডাক্তার লইয়া যাইতে হইবে। সুনীতিবাবুর সহিত আর দেখা করা হইল না।"

নারায়ণ বলিল, "আজ আমি তাঁহাকে আপনার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি কালই আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। আপনি যদি আজ রাত্রেই চলিয়া যান তাহা হইলে এখনই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারেন। কিছু টাকা লইয়া যাইতে পারিবেন।"

বাবুরাম বলিল, "এত রাত্রে তাঁহাকে বিরক্ত করিব না। আপনি তাঁহাকে বলিবেন, কাল বৈকালে আমি গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিব, তিনি যদি দয়া করিয়া যান তাহা হইলে পথে কোনও অসুবিধা হইবে না।" এই বলিয়া বাবুরাম অতি কাতর ভাব দেখাইয়া নারায়ণের নিকট বিদায় লইল।

পরদিন প্রাতে নারায়ণ সকল কথা সুনীতির নিকট বলিল। বাবুরাম বেশী করিয়া দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য বলিয়াছিল যে পূর্ব্বে তাহারা গ্রামের মধ্যে বিশেষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল, জমিদারের অন্যায় ক্রোধের পাত্র হইয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় তাহাদের সকল সম্পত্তি হারাইয়াছে। সুনীতির হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। সে বলিল সেইদিনই দুপ'রের গাড়ীতে যাত্রা করিবে।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিপদ

বৈকালে ৪৷৷৹টার সময় বনপাশ ষ্টেশনে স্থনীতি গাড়ী হইতে নামিল। একজন লোক দ্রুতগতিতে তাহার নিকট আসিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিল এবং বলিল, "স্থনীতিবাবু, আমার কথাই নারায়ণ আপনাকে বলিয়াছে। আমার মা-ঠাকুরুণের অবস্থা অতি শোচনীয়। আমাদের গ্রামে ডাক্তার নাই। কাল কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তার আনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে এখানে রাখিয়া বেশীদিন চিকিৎসা করাইবার মত অবস্থা আমার নাই।"

ষ্টেশনের বাহিরে একটী গরুর-গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। উভয়ে গাড়ীতে উঠিবার পর গাড়োয়ান গরু জুড়িয়া গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিল। ষ্টেশনের কম্পাউণ্ডের বাহিরে পান সিগারেটের দোকান, খাবারের দোকান এবং অন্য দুই চারিটি কুটির অতিক্রম করিয়া গাড়ী মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ধান কাটা হইয়াছে উভয় পার্শ্বে অনাবৃত মাঠ দিগন্তপর্যান্ত বিস্তৃত। মধ্যে গাড়ীর চাকায় গভীর ভাবে অঙ্কিত পথ। সুদীর্ঘ আলগুলি দ্বারা মাঠ বহু ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে। দুই একটী বৃক্ষ স্থানে স্থানে মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। মনে হয় যেন এই বৃক্ষগুলিকে তাহাদের সঙ্গিহীন জীবন অত্যন্ত নিরানন্দে কাটাইতে হয়। দূরে স্থানে স্থানে বৃক্ষের ঘন সমাবেশ লোকালয় নির্দ্দেশ করিতেছিল।

ধীরমন্থরগতিতে গাড়ী চলিতে লাগিল। স্থনীতির রৌদ্রতপ্ত ক্লান্ত

শরীর বৈকালের মৃদু সমীরণে শীতল হইল। কদাচিৎ পথিপার্শ্বে দুই একটী সরোবর। সমীরণ স্পর্শে সরোবরের জলরাশি কান্তস্পৃষ্ট নায়িকার শরীরের ন্যায় পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় শুভ্রবর্ণের জলজ পুষ্পগুলি শ্যামল-পত্রাবলির সহিত আন্দোলিত হইতে-ছিল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলোক সেই তরঙ্গিত জলের উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

ক্রমে সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিলেন এবং দিগন্তস্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলেন। বাবুরাম সুনীতিকে বলিল, যে এখনও দুই ক্রোশ পথ বাকী আছে। তখন সুনীতি গাড়ী রাখিতে বলিয়া অদূরবর্ত্তী জলাশয়ের তীরে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিল।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি। চন্দ্র রাত্রে উদয় হইবে। সন্ধ্যা হইবার পরেই বড় অন্ধকার হইল। সুবর্ণ-খচিত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রের ন্যায় নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ শোভা পাইতে লাগিল।

পথের ধারে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। অন্ধকারে অস্পষ্ট ভাবে তাহাদিগকে দেখা যাইতেছিল। গাড়ী তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে একজন কাছে আসিয়া গাড়ী ভাল করিয়া দেখিয়া শীষ দিল। তৎক্ষণাৎ বাবুরাম গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। গাড়োয়ান নামিয়া পড়িয়া গাড়ী থামাইল। বাবুরাম এবং তাহার দলের লোকেরা গাড়ী ঘেরিয়া দাঁড়াইল। বাবুরাম সুনীতিকে বলিল, "সুনীতিবাবু, আপনি নামিয়া আসুন।"

সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি হইয়াছে ?"

বাবুরাম বলিল, "আপনি ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছেন।"

সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা ডাকাত ?"

বাবুরাম বলিল, "লোকে ত তাহাই বলিয়া থাকে।"

সুনীতি দেখিল গাড়ী হইতে নামিলে ইহাদের হাতে আত্মসমর্পণ ব্যতীত উপায় থাকিবে না। গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিলে তবু কিছুক্ষণ ঠেকাইয়া রাখা যাইবে। সে গাড়ী হইতে নামিল না, গাড়ীর মধ্যে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "কে আছ এস। ডাকাত পড়িয়াছে।"

বাবুরাম বলিল "এখান হইতে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে কোনও গ্রাম নাই বৃথা কষ্ট করিতেছেন। আপনি যখন নিজে নামিতেছেন না, তখন জোর করিয়া নামাইতে হইল।"

বাবুরামের আদেশে একজন গাড়ীতে উঠিয়া সুনীতির হাত ধরিতে গেল। সুনীতি ক্ষিপ্রহস্তে ডাকাইতের হাত নিজের মুষ্টিদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া সজোরে পীড়ন করিল। হাতের কব্জির কাছে খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। "বাবারে, হাত ভেঙ্গে গেছে" বলিয়া ডাকাইত নামিয়া পড়িল।

তখন চপ্‌চাপ্ করিয়া গাড়ীর চালের উপর লাঠি পড়িল। ডাকাইতেরা গাড়ীর মধ্যেও লাঠির দ্বারা সুনীতিকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। সুনীতির সঙ্গে একটা ছোট লাঠি ছিল—বাবুদের প্রিয় সৌখীন লাঠি নহে। যথার্থ লাঠি; প্রয়োজন হইলে তাহার দ্বারা আত্মরক্ষা করা যায় এবং আঘাত দেওয়া যায়। অনেক খুঁজিয়া পাহাড়ে কাঠের অতিশয় শক্ত ও ভারী লাঠি সুনীতি সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই লাঠির সাহায্যে সুনীতি আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ীর মধ্যে ডাকাইতেরা ভাল রকম লাঠি চালাইতে পারিতেছিল না। সুনীতির লাঠি ছোট বলিয়া গাড়ীর মধ্যে ব্যবহার করিবার সুবিধা ছিল। সুতরাং সুনীতি বহুপরিমাণে অব্যাহতি পাইল।

বাবুরাম হুকুম দিল গাড়ীর চাল কাটিয়া ফেল। তাহার দলের লোকেরা দড়ি কাটিয়া চালা তুলিয়া ফেলিল। তখন চারিধার হইতে

লাঠি বর্ষণ হইতে লাগিল। তথাপি সুনীতি কিছুক্ষণ আটকাইয়াছিল। কিন্তু দুই চারি ঘা লাঠি সজোরে তাহাকে আঘাত করিল। সুনীতি ভাবিল এই ভাবে কিছুক্ষণ চলিলে দৈবাৎ সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হওয়া অসম্ভব নহে। সে বলিল, "আর আমি বাধা দিব না, তোমরা থাম।" আক্রমণকারীরা ক্ষান্ত হইল। বাবুরাম বলিল "তোমার লাঠি ফেলিয়া দাও।" সুনীতি ফেলিয়া দিল। বাবুরাম বলিল, "নামিয়া আইস।"

সুনীতি ভাবিল যদি গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে গাড়ী এখানে পড়িয়া থাকিবে এবং কেহ যদি সাহায্য করিতে আসে তাহা হইলে ভাঙ্গা গাড়ী দেখিয়া সে বুঝিতে পারিবে যে ডাকাইতেরা নিকটের জঙ্গলেই আছে। এই ভাবিয়া সুনীতি সজোরে পদাঘাত করিয়া গাড়ীর একটা চাকা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তখন ডাকাইতেরা সুনীতির হাত ও মুখ বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া চলিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পল্লীসংস্কার

সুনীতির সহিত মৃন্ময়ীর বিবাহের পরে বিপিনের জীবনের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকের অবগত হওয়া প্রয়োজন।

বিপিনের একমাত্র ভগ্নী ছিল, কোনও ভাই ছিল না। ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। যাহা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল তাহাতে তাহার ও তাহার বিধবা মাতার মোটা ভাত ও কাপড়ের কোনও অভাব হইত না।

বি, এ, পাশ করিয়া বিপিন ইউনিভার্সিটির পড়া ছাড়িয়া দিল। কিছু সংস্কৃত পড়িল—ধর্ম্মগ্রন্থ। কিছু অর্থনীতি পড়িল—পাণ্ডিত্যের জন্য নহে, দেশের প্রকৃত উপকার করিবার জন্য। তাহার পর মাতার অনুমতি লইয়া বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে কিছু দিনের জন্য বাহির হইল।

সে যে গ্রামে যাইত সেখানকার দেবালয়ে অতিথি হইত। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিলিয়া গ্রামের কি অভাব অগ্রে তাহাই স্থির করিত। যে সকল যুবকবৃন্দ গ্রামে অলসভাবে কাল কাটাইত তাহাদিগকে লইয়া সে গ্রামের অভাব দূরীকরণে অগ্রসর হইত। যে পুষ্করিণীর বহু দিন পঙ্কোদ্ধার হয় নাই, সকলে মিলিয়া তাহার পঙ্কোদ্ধার আরম্ভ করিত। পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী রাখিবার উপযোগিতা বুঝাইত। অনাবশ্যক জঙ্গল কাটিয়া ফেলিত। যেখানে জল জমে সেখান হইতে পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিত। নর্দ্দমা কাটিয়া যে মাটি উঠিত তাহা হইতে নিম্নস্থানগুলি পূরণ করিত। এই ভাবে বিনাব্যয়ে অল্পদিনের মধ্যে গ্রামের এত আমূল পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল যে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। দুপর বেলায় তাস ও দাবার আড্ডায় এখন আর লোক হয় না। নিয়মিত পরিশ্রমে যুবকদের স্বাস্থ্য উন্নত এবং চিত্ত প্রফুল্ল হইতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যে পল্লীবাসীদের বিশ্বাসভাজন হইয়া তৎপরে যৌথ ঋণদানের আয়োজন আরম্ভ করিল। ইহাতে দরিদ্র কৃষকেরা মহাজনের উৎপীড়নকারী সুদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। গ্রামে দুই তিন ঘর তাঁতী ছিল তাহাদের ব্যবসা এক্ষণে এক রকম গিয়াছিল। যৌথ-ঋণ-দান সমিতি হইতে তাহারা ঋণ-গ্রহণ করিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিল। বিপিন গ্রামবাসিগণকে বুঝাইল তাহারা যেন গ্রামের তাঁতীর প্রস্তুত বস্ত্রই ব্যবহার করে। ইহাদের বস্ত্র

গ্রামবাসিগণ ব্যবহার না করিলে কি করিয়া ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে? হইলই বা মোটা কাপড়। দরিদ্র কৃষকপুত্রদিগকে বিনাব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যুবকেরা একটা সমিতি করিল।

এই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনও হইতে লাগিল। দেবমন্দিরের সংস্কারের জন্য জমিদারের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইল। কিছু দিনের মধ্যেই দেবমন্দির নূতন শ্রী ধারণ করিল। প্রায় প্রতি রাত্রেই হরিসঙ্কীর্ত্তন হইত। উৎসবের দিন বিগ্রহ সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া গ্রামের মধ্যে শোভাযাত্রা করা হইত। একটি টোল এবং অতিথি আশ্রম স্থাপন হইল। সৎসাহিত্য প্রচারের জন্য একটী পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইল।

দুই তিনটি গ্রাম লইয়া এই প্রকারের একটী মণ্ডল স্থাপিত হইল। বৎসর দুই চেষ্টায় মণ্ডলের অনুষ্ঠানগুলি স্থায়ী করিয়া বিপিন অন্য গ্রামে গিয়া এই প্রকার কার্য্য আরম্ভ করিত। যে স্থানে বিপিন নিজে যাইত শুদ্ধ সেই গ্রামগুলিরই যে উন্নতি হইত তাহা নহে। দেখা দেখি অন্যান্য গ্রামেও এই সকল শুভ অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার সময় বিপিন এই অঞ্চলে তাহার পল্লী-সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিছুদিন হইতে তাহার মাতা তাহাকে কলিকাতায় আসিতে পত্র দিতেছিলেন। আজ রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী ফিরিবে বলিয়া সে দ্রুতপদে ষ্টেশন অভিমুখে চলিতেছিল। এক হাতে একটী ক্যাম্বিশের ব্যাগ। অপর হাতে একটী যষ্টি। নগ্নপদ। রাত্রি অন্ধকার। পথ নির্জ্জন। কিন্তু এরূপ নির্জ্জন পথে যাওয়া তাহার অভ্যাস হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র আশঙ্কা হয় নাই; নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে সে পথ অতিক্রম করিতেছিল।

এমন সময় দূরে নৈশবায়ু-তরঙ্গে কাহার আর্ত্তকণ্ঠস্বর শোনা গেল। একবার—তুইবার—তিনবার। অস্পষ্ট, কারণ বহুদূরাগত। কিন্তু বোধ হইল কে যেন আসন্ন বিপদে সাহায্যের জন্য আকুলভাবে আহ্বান করিতেছে। বিপিন দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। আর শব্দ পাওয়া গেল না। ইহাতে বিপিন অধিকতর আশঙ্কান্বিত হইল। প্রায় আট দশ মিনিট চলিবার পর পথের উপর কি একটা বস্তু রহিয়াছে অন্ধকারে বুঝিতে পারিল। নিকটে আসিয়া বুঝিল গরুর গাড়ী, চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বিপিন অনুমানে বুঝিল যে, সে যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল সে শব্দ এখানেই উত্থিত হইয়াছিল। যদি কোনও তুর্ব্বৃত্ত অসহায় পথিকের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে তাহা হইলে ঘটনার পর তাহাদের রাজপথে না চলিয়া মাঠের মধ্য দিয়া যাওয়াই সম্ভব। মাঠের মধ্যে কোন্ পথে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া বিপিন তুইচারি মিনিট দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময় পূর্ব্ব প্রান্তে বৃক্ষাবলির পশ্চাতে চন্দ্র উদয় হইল এবং চন্দ্রের অপর্য্যাপ্ত জ্যোৎস্নায় প্রান্তর প্লাবিত হইল। সেই জ্যোৎস্নালোকে বিপিন দেখিতে পাইল দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত কোনও জঙ্গল নাই, কিন্তু উত্তরে কিছুদূরে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। তুর্ব্বৃত্তদের জঙ্গলের পথ ধরিয়া যাওয়াই সম্ভব মনে করিয়া বিপিন তাহার ব্যাগটি গাড়ীর তলায় রাখিয়া সেই পথ ধরিয়াই চলিল। জঙ্গলের নিকটে আসিয়া দেখিল একটী সরু গ্রাম্য পথ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া বিপিন কোথাও কোন শব্দ হইতেছে কিনা লক্ষ্য করিতে করিতে চলিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার বোধ হইল অদূরে বৃক্ষপুঞ্জের মধ্যে মনুষ্য শব্দ শ্রুত হইতেছে। অতি সন্তর্পণে ছায়ায় ছায়ায় সে শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিল। একটী বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল প্রায় সাত আটজন তুর্ব্বৃত্ত একটী ভদ্রলোককে

একটা বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভদ্রলোকের মুখ চাদর দিয়া বাঁধা। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিপিন চিনিতে পারিল,—কি সর্ব্বনাশ, এ যে সুনীতি। দুর্ব্বৃত্তদের মধ্যে কি পরামর্শ হইল। তাহার পর তাহাদের মধ্যে যাহাকে দলপতি বলিয়া বোধ হইতেছিল, সে একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আর কেন ; এইবার শেষ করিয়া ফেল।" যাহাকে এই কথা বলা হইল সে ভূমি হইতে একটা খড়্গ তুলিয়া লইল। সেই খড়্গের শাণিত ধারের উপর চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া বিপিন শিহরিয়া উঠিল। আর সময় নাই। যাহা করিবার এইমুহূর্ত্তেই করিতে হইবে। কিন্তু সে কি করিতে পারে? সে একা। হস্তে অপর কোনও অস্ত্র নাই, কেবল একটি লাঠি। এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে আক্রমণ করিয়া দুই এক জনকে জখম করিতে পারে মাত্র। কিন্তু পরক্ষণে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। এবং তাহার মৃত্যুর পর সুনীতির পালা। সুতরাং সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সুনীতির মৃত্যু মাত্র কয়েক মিনিট পিছাইয়া দিতে পারে। নিজের প্রাণ দিতে বিপিন কিছুমাত্র কাতর হইল না, কিন্তু ভাবিতে তাহার বড় কষ্ট হইল যে নিজের প্রাণ দিয়াও সে সুনীতিকে বাঁচাইতে পারিবে না। এক মুহূর্ত্তের জন্য বিপিনের হৃদয়ে মৃন্ময়ীর অশ্রুপূর্ণ মুখচ্ছবি উদিত হইল। পরক্ষণেই সে একলম্ফে আততায়ীর নিকট অগ্রসর হইয়া সজোরে খড়্গের মধ্যস্থলে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিল। খড়্গ ভাঙ্গিয়া হাত হইতে পড়িয়া গেল। চক্ষের নিমিষে বিপিন আরও দুইজন দুর্ব্বৃত্তকে যষ্টির আঘাতে ধরাশায়ী করিল। বাকী চারিজন দুর্ব্বৃত্ত এই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক আক্রমণ-জনিত বিহ্বলভাব দূর হইলে পর বিপিনকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। বিপিন লাঠিখেলায় সিদ্ধহস্ত ছিল। এত বেগের সহিত অথচ দৃঢ়হস্তে সে লাঠি ঘুরাইতে লাগিল যে আক্রমণকারীদের প্রতি চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। মনে হইল বিপিনের লাঠি শরীরের চারিদিকেই সমকালে

বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে পলায়ন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু সুনীতিকে একা ফেলিয়া যাওয়া হইতে পারে না, এই ভাবিয়া সে সেখানে দাঁড়াইয়াই আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে লাঠি ঘুরাইলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। বিপিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম; আততায়ীদের ক্লেশ অপেক্ষাকৃত কম। দুই একটা আঘাত তাহার গায়ে লাগিল। কোনওবার বা অস্থানে বেশী জোরে লাগিল। বিপিন বুঝিল আর বেশীক্ষণ চলিবে না। মাথায় একবার আঘাত লাগাতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল "এখানে কি কেহ নাই?" তাহার মাথার মধ্যে গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। বাহ্যজ্ঞান ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে লাগিল। তথাপি সে প্রাণপণ করিয়া লাঠি ঘুরাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল অদূরে বনভূমির প্রান্তভাগে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমরা যাইতেছি"। কিন্তু বিপিন বুঝিতে পারিল না, সত্যই সে শব্দ শুনিল, না মনের ভ্রম। হাত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে তাহার সংজ্ঞাহীন শরীর মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার
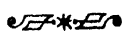
পাঠকেরও কৌতূহল হইতে পারে বিপিন যে শব্দ শুনিয়াছিল তাহা বাস্তবিক না বিপিনের ভ্রম। তাহার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।

সুনীতি যেদিন যাত্রা করিয়াছিল সেদিন অপরাহ্ণে নারায়ণ সুনীতির বাড়ীতে আসিল। নারায়ণকে দেখিয়া অনুকূল বলিল, "নারায়ণ, তোমাকে কয়দিন থেকে বলিব ভাবিতেছি, তুমি বদলোকের সঙ্গী হইয়াছ কেন?" নারায়ণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?" অনুকূল বলিল, "আমি সেদিন দেখিলাম যে বাবুরাম নামে একটা বদমাইস লোক তোমার সঙ্গে যাইতেছে।" এই বলিয়া অনুকূল বাবুরামের চেহারা বর্ণনা করিল। নারায়ণ বলিল "ঐ চেহারার একজন লোকের সহিত কয়দিন হইতে আমার পরিচয় হইয়াছে কিন্তু তাহার নাম বাবুরাম নহে।" এই বলিয়া বাবুরাম তাহার যে মিথ্যা নাম ও পরিচয় দিয়াছিল, নারায়ণ অনুকূলকে তাহা বলিল। এবং অবশেষে বলিল যে তাহার বিপদেই সাহায্য করিতে সুনীতি আজ বনপাশ গিয়াছে। অনুকূল বলিল, "নিশ্চয়ই ইহার পশ্চাতে কোনও চক্রান্ত আছে। আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি সে লোকটা বাবুরাম ভিন্ন আর কেহ নহে। সুনীতি নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িবে। চল এখনই আমরা বনপাশ যাই। ঈশ্বর করুন আমাদের বেশী দেরী না হইয়া যায়।" নারায়ণ বলিল "এখন কি ট্রেণ আছে?" তাড়াতাড়ি টাইম টেব্‌ল্ দেখা হইল। তিন ঘণ্টা পরে একটা গাড়ী ছাড়িবে, রাত্রি দুপরে সে গাড়ী বনপাশ পৌছিবে। অনুকূল বলিল, "এত দেরী কিছুতেই করিতে পারিব না। দেখি বৌমার কাছে টাকা আছে কি না। টাকা থাকিলে স্পেশ্যাল ট্রেণে করিয়া যাইতে হইবে।" এই বলিয়া অনুকূল বাড়ীর ভিতরে গিয়া সাবিত্রীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। সাবিত্রী মৃন্ময়ীর কাছে গেল। মৃন্ময়ী মেঝেতে শুইয়াছিল। তাহার কাছে বসিয়া তাহার ছেলে একটী সচিত্র মহাভারতের পাতা উল্‌টাইয়া ছবি দেখিতেছিল। বহিখানি পড়িবে বলিয়া মৃন্ময়ী সেখানি আনিয়াছিল, কিন্তু খোকা ঘুম

হইতে উঠিয়া তাহা বেদখল করিয়া লইয়াছিল। আজ আর পড়া হইবে না। খোকা বহিখানি ছিঁড়িয়া না ফেলিলেই যথেষ্ট। খোকা বহিখানির পাতা উল্টাইতেছিল এবং ছবি বাহির হইলে উল্লাসে করতালি দিয়া মায়ের মুখ ধরিয়া ফিরাইয়া ছবি দেখাইতেছিল। সাবিত্রী আসিয়া কাছে বসিল। বসিয়া বলিল, "মিনু, ঠাকুরপো আজ একা গিয়া ভাল কাজ করেন নাই। কোনও বিপদ না হইলে মঙ্গল। সেদিন সকালে জানালা থেকে একটা কালো লোক দেখিয়া তুমি ভয় পাইয়াছিলে বোধ হয় সেই লোকটাই কোনও চক্রান্ত করিয়া ঠাকুরপোকে লইয়া গিয়াছে।" মৃন্ময়ী উঠিয়া বসিল। আশঙ্কায় তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সাবিত্রী বলিল, "তোমার ভাশুর বলিতেছেন তিনি এখনই যাইবেন। কিন্তু এখন কোনও গাড়ী ছাড়িবে না। গাড়ীর জন্য বসিতে হইলে দুই তিন ঘণ্টা বসিতে হইবে। তাহাতে বড় দেরী হইবে। এখন এক মিনিটও ফেলা যায় না। তোমার কাছে যদি টাকা থাকে তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা স্পেশ্যাল ট্রেণে এখনই রওনা হন।' মৃন্ময়ী বলিল, "আমার কাছে তাঁর বাক্সর চাবি আছে। কত টাকা দরকার জিজ্ঞেস করে এস।" মৃন্ময়ী প্রয়োজনীয় টাকা বাহির করিয়া দিল। অনুকূল ও নারায়ণ তৎক্ষণাৎ রওনা হইল। পুলিস ষ্টেশনে গিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সহিত দেখা করিয়া কয়েকজন সশস্ত্র কনষ্টেবল লইল। তাহার পর দুইটি ট্যাক্সি করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অনুকূল নারায়ণকে বলিল, "আমি Special train এর বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছি। তুমি ইতি মধ্যে বনপাশ ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারকে একখানি টেলিগ্রাম কর যে ৪॥০ টার সময় বনপাশে যে গাড়ী পৌছিবে তাহা হইতে সুনীতিবাবু নামিলে তাঁহাকে কোনও মতেই ষ্টেশন হইতে যাইতে দেওয়া না হয়। তিনি বদমাইস

লোকের চক্রান্তে পড়িয়াছেন, আমরা যাইতেছি, সকল কথাই টেলিগ্রামে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবে। সাড়ে চারটা বাজিতে ত দেরী নাই, গাড়ী এখনই বনপাশ ষ্টেশনে পৌছিবে। তাহার পূর্ব্বে টেলিগ্রাম না পাইবারই কথা।"

নারায়ণ টেলিগ্রাফ আফিসে ছুটিল। টেলিগ্রাফ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিল আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্পেশ্যাল ট্রেণ (Special'train) এর বন্দোবস্ত হইবে। মোটরকার দুইটি সঙ্গে যাইবে তাহারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। সে আধ ঘণ্টা আর কাটিতে চাহে না। এক একটি মিনিট এক এক ঘণ্টার মত বোধ হইতে লাগিল। অনুকূল একবার বসিল, একবার উঠিয়া চঞ্চল পদক্ষেপে প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ষ্টেশনে অবিরাম জনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। দলে দলে লোক ভিতরে আসিতেছে ও বাহিরে যাইতেছে। তাহাদের এত বড় একটা বিপদের দিনে পৃথিবীর তুচ্ছ বিষয়ে এত ব্যস্ততা অত্যন্ত অশোভন বোধ হইল।

যথাসময়ে তাহাদের গাড়ী ছাড়িল। ট্রেণের গতিও আজ যথেষ্ট দ্রুত নহে বলিয়া বোধ হইল। রেললাইনের ধারে ছোট ছোট গ্রামগুলি দেখা যাইতেছিল। গ্রাম্য-জীবন তাহাদের চক্ষে আজ কত শান্তিপূর্ণ ও লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেখানে কাহারও এত বিপদ হয় নাই। অনুকূল ও নারায়ণ উভয়ে নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিল।

নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটী ষ্টেশন ব্যতীত গাড়ী দাঁড়াইল না। সাধারণ ট্রেণের জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে তদপেক্ষা এক ঘণ্টা কম সময়ে এই গাড়ী বনপাশ পৌছিল। ষ্টেশন মাষ্টার প্ল্যাটফর্ম্মেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ট্রেণ আসিবার কুড়ি মিনিট পরে তিনি টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন। তখন প্ল্যাটফর্ম্মে কোনও যাত্রী ছিল না।

যথাসম্ভব শীঘ্র মোটরকার নামাইয়া ইহারা রওনা হইল। এখানকার পথ জানে এমন একজন লোক সঙ্গে চলিল। নির্জ্জন পথ। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সামনের বড় হেড্‌লাইট্ দুইটি জ্বালিয়া দিয়া মোটরকার ছুটিয়া চলিল। যদি দৈবাৎ কোনও গ্রামবাসী রাস্তায় থাকে এই জন্য বার বার শব্দ করিতে লাগিল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে যখন স্পেশ্যাল ট্রেণ ছাড়ে তখন তাহারা সুনীতির চার ঘণ্টা পশ্চাতে ছিল। বনপাশ ষ্টেশন যখন তাহারা পরিত্যাগ করে তাহার তিন ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে সুনীতির ছাড়িবার কথা। এখান হইতে যে পথ প্রান্তরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে সে পথে ৪।৫ ক্রোশের মধ্যে গ্রাম নাই। সুতরাং গরুর গাড়ী গ্রাম পর্য্যন্ত যাইবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই সে গাড়ী ধরা যাইবে। এমন সম্ভব যে, যখন তাহারা গরুর গাড়ী পাইবে তাহার পূর্ব্বেই সুনীতিকে ডাকাইতেরা গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও কোথায় নামাইয়া লইয়াছে তাহা গাড়ীর গাড়োয়ানের নিকট জানিতে পারা যাইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অনুকূল বরাবর গাড়ী ছুটাইয়া চলিল। প্রায় পনর মিনিট গাড়ী ছুটাইবার পর মোটরকারের আলোকে পথের উপর কি একটা পদার্থ দেখা গেল। সে পদার্থটা একটা গরুর গাড়ী হইতে পারে এরূপও বোধ হইল। বার বার মোটরকারের হর্ণ্ বাজান হইল। তথাপি সে জিনিষটা সরিল না। তখন তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিল যে একটা গরুর গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। অনুকূল স্থির করিল, এই গাড়ীতেই সুনীতি আসিয়াছিল এবং এইখানে সে গাড়ী হইতে নামিয়াছে। বিপিনের ন্যায় ইহারাও চন্দ্রালোকে জঙ্গল দেখিতে পাইয়া সেই পথেই চলিল। তাহারা সকলে ছুটিতে ছুটিতে যাইতেছিল, কারণ প্রতি মুহূর্ত্তই অতি মূল্যবান্। জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা শুনিতে পাইল কে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "এখানে কি কেহ নাই ?"

তখন অনুকূল চীৎকার করিয়া বলিল "ভয় নাই আমরা যাইতেছি।" মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। দেখিল একজন পড়িয়া রহিয়াছে। ডাকাইতেরা তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত। অনুকূল এবং তাঁহার সঙ্গীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "খবরদার, যে লাঠি মারিবে তাহাকে গুলি করিব।" ডাকাইতেরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দুই একজন পলায়ন করিল। কিন্তু অধিকাংশই পুলিশের হাতে ধরা পড়িল।

নিপতিত ব্যক্তির নিকট অগ্রসর হইয়া অনুকূল বলিল, "এ ত সুনীতি নয়।" নারায়ণ অদূরস্থিত বৃক্ষ সংলগ্ন ব্যক্তিকে দেখাইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গেল, এবং চিনিতে পারিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সুনীতি দাদা, সুনীতি দাদা।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সুনীতির বন্ধন ছিন্ন হইল। সুনীতি বিপিনের নিকট গিয়া বসিল। বিপিনের সংজ্ঞা নাই। মুখে ও চক্ষে জলের ছিটা দিতে দিতে তাহার জ্ঞান হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কিন্তু কথা কহিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে রাজপথ অভিমুখে লইয়া চলিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ
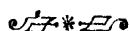
উৎকণ্ঠিতা

সমস্ত রাত্রি মৃন্ময়ী ও সাবিত্রী প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত জাগিয়া রহিল। রাত্রি গভীর হইল। রাজধানীর কোলাহল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল। ক্বচিৎ দুই একটী গাড়ী ঘর্ঘর শব্দে রাজপথ মুখরিত করিয়া যাইতেছিল। মোটরকারের শব্দ দ্রুতভাবে প্রবল হইয়া আবার দ্রুতভাবে ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া মৃন্ময়ী সাবিত্রীকে বলিল "দিদি, কোন্ পথে তিনি গিয়াছেন কিছুই জানা নাই। কি করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে?" সাবিত্রী বলিল "বোন্, সকলই ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অতি বড় বিপদও অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। একমনে তাঁহাকেই ডাক।" মৃন্ময়ী মন স্থির করিয়া ভগবানকে ডাকিতে চেষ্টা করিতেছিল। মাঝে মাঝে মন বেশ স্থির হয়। কিন্তু যখন তাহার মনে হইতেছিল, হয়ত তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তখন তাহার হৃদয় একান্ত অধীর হইয়া উঠে। সে এক একবার উঠিয়া গিয়া বাহিরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইতেছিল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে। চন্দ্রালোক গৃহশ্রেণী ও বৃক্ষাবলির উপরে পড়িয়া এক স্থির সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তার শ্রেণীবদ্ধ আলোক গুলি জ্বলিতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কদাচিৎ দুই একটী কুকুরের ধ্বনি সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। তাহার স্বামী এক্ষণে কোথায়

এবং কি অবস্থায় ভাবিয়া সে পুনরায় চঞ্চল চরণে গৃহে আসিয়া বসিল। সাবিত্রী বলিল, "বোন্, ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী পিপীলিকাকেও কেহ আঘাত করিতে পারে না। তোমার স্বামী অরণ্যে বা দস্যুহস্তে যেখানেই থাকুন, সেখানেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন। এস আমরা প্রাণপণে ডাকি, যেন তিনি তোমার স্বামীকে রক্ষা করেন। আবার আমি তোমায় বলি, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তোমার স্বামীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। এস আমরা প্রার্থনা করি যে যদি আমরা ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে কোনও পাপ করিয়া থাকি যাহার জন্য নিয়তির দণ্ড উদ্যত হইয়াছে তাহা হইলে ঈশ্বর যেন আমাদের সে পাপ ক্ষমা করেন। কারণ তাঁহার করুণা অনন্ত। আমরা অতি মন্দমতি, অতি নির্ব্বোধ। আমাদিগকে তিনি যেন শুভমতি দেন।" মৃন্ময়ী অশ্রু পরিপ্লুত মুখখানি তুলিয়া সাবিত্রীর দিকে আকুল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল "দিদি, কি হইবে?" সাবিত্রী নিঃশব্দে মৃন্ময়ীর মুখখানি নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইল এবং অশ্রু মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর তপ্ত ললাটের উপর স্বীয় কোমল হস্তখানি বুলাইতে লাগিল।

* * * * *

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল। বিহগকুলের উচ্ছ্বসিত কলরবে বায়ু পরিপূর্ণ হইল। স্নিগ্ধ ও শীতল সমীরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহকোণস্থিত প্রদীপকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ঈষৎ রক্তিমচ্ছটায় পূর্ব্বাকাশপ্রান্ত অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

শব্দ শুনিয়া মনে হইল যেন একটী মোটরকার আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। সাবিত্রী ও মৃন্ময়ী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে উঠিয়া গেল। বাটীর সম্মুখে বাগান, তাহার পর গেট। গাড়ী হইতে কাহারা নামিল

দূর হইতে চেনা গেল না। তবে ইহা বোঝা গেল সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া কাহাকে লইয়া আসিতেছে। মৃন্ময়ীর শরীরের মধ্যে শোণিত প্রবাহ যেন স্থির ও শীতল হইয়া গেল। তাহার বক্ষের মধ্যে প্রবলবেগে স্পন্দন হইতে লাগিল। তাহার চক্ষের সমক্ষে জগৎ অন্ধকার হইয়া আসিল। সে পড়িয়া যাইতেছিল, সাবিত্রী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

পরিশিষ্ট

উত্তম চিকিৎসা ও উপযুক্ত শুশ্রূষার গুণে বিপিন শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল। বিপিনের মাতা সুনীতির বাটীতে আসিয়া ছিলেন। মৃন্ময়ীকে তিনি বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছেন এবং কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। সাবিত্রীর গুণাবলি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। সাবিত্রীর পিত্রালয়ের সংবাদ লইয়া তিনি জানিলেন যে সাবিত্রীর এক অবিবাহিতা ভগ্নী আছে। তিনি মনে কোনও সংকল্প করিয়া সুনীতিকে বলিয়া সাবিত্রীর ভগ্নীকে কলিকাতায় আনাইলেন। সাবিত্রীর ভগ্নীর নাম উর্ম্মিলা। বিপিনের মাতা দেখিলেন যে উর্ম্মিলা রূপে ও গুণে তাহার দিদিরই সমতুল্য। তিনি পুত্রকে ধরিয়া বসিলেন, উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিপিন মাতার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিল না। তাহার অসুখের সময় যে সবিত্রী রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য বিপিনের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বুঝি আরও কিছু ছিল। নবাগত কিশোরী বালিকার সুন্দর মুখচ্ছবি ও সলজ্জ ব্যবহার কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বিপিনের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। সাবিত্রীর হৃদয়ে বিপিন যে অমূল্য গুণরাশির পরিচয় পাইয়াছিল, এই বালিকার হৃদয়েও তাহা থাকিতে পারে বলিয়া বোধ হয় সে প্রলুব্ধ হইয়াছিল। মাতৃ-আদেশ পালন করা যখন এতদূর সুখসাধ্য হয়, তখন কোন্ কর্ত্তব্য-পরায়ণ পুত্র সে বিষয়ে তৎপর না হয়? বিপিন ততদূর অবাধ্য ছিল না।

তাহার উপর মৃন্ময়ী বিপিনকে দিব্য দিয়াছিল যে, বিপিন যদি ঊর্ম্মিলাকে বিবাহ না করে তাহা হইলে সে বিপিনের সঙ্গে 'কথ্‌খনো' কথা বলিবে না, জন্মের মত আড়ি হইবে।

শুভদিনে ও শুভলগ্নে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। কয়দিন ধরিয়া সানাইয়ের সুমধুর সঙ্গীত, আনন্দ কোলাহল, স্বজন-সমাগম, ভোজন সমারোহ এবং উজ্জ্বল বেশভূষা এক অপার্থিব রাজ্য গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। বাহিরের উৎসব যখন থামিয়া গেল তখনও বিপিনের অন্তর রাজ্যের উৎসব দিবসগুলি স্বপ্নের ন্যায় কাটিতে লাগিল।

সুনীতি ও মৃন্ময়ী, অনুকূল ও সাবিত্রী, বিপিন ও ঊর্ম্মিলা সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকুক। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমরা এই অবসরে বিদায় গ্রহণ করি।